ঐতিহাসিক সন্দর্ভ।

বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠোপযোগী

গদ্য সাহিত্য।

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ সঙ্কলিত।

Calcutta :

PRINTED AND PUBLISHED BY JADAV CHANDRA LAHIRI,
AT THE BHARAT MIHIR PRESS,
46, Panchanan Tala Lane.

১৮০৭ শক।

ভূমিকা।

ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ। যে জাতির নিকট ইতিহাসের আদর নাই, তাহাদের সাহিত্য সজীব ও জাতিপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত হয় না। পৌরাণিক কাব্য ও উপাখ্যান পাঠ করিয়া পাঠকের মন অলৌকিক ভাবে পূর্ণ হয়, এবং বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেকহেতু অন্তঃকরণ অপার্থিব বিষয়চিন্তনে ও কৌতূহলস্পৃহার চরিতার্থতা সম্পাদনে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা সহানুভূতির উন্মেষ হয় না—আপনার বা স্বজাতির সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ও উত্থান পতনের সহিত তাহার তেমন সম্বন্ধ থাকে না। ভীষ্মার্জ্জুনের লোকাতীত বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়া কেহ তাঁহাদের ন্যায় যোদ্ধা হইতে ইচ্ছা করে না, যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের অতুল সত্যনিষ্ঠা ও অনন্ত গুণরাশি শ্রবণ করিয়া কেহ তাঁহাদের দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের অনুকরণ করিতে সাহসী হয় না। কেন না, তাঁহারা দেবতারূপে বর্ণিত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং মনুষ্যের অনুকরণীয় নহেন। কিন্তু ইতিহাসপাঠের ফল এরূপ নহে। ইতিহাস যাঁহাদিগের পরিচয় দেয়, তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় সুখ দুঃখের ভাগী ছিলেন; আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও নানারূপ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইত; তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা মানবীয় শক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের জীবন আমাদের জীবন-চিত্রের আদর্শ হইতে পারে; তাঁহাদের অবস্থা, কার্য্য-প্রণালী ও উন্নতি-অবনতি হইতে আমরা মহত্তর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি। এই গুণেই ইতিহাস জাতীয় জীবন গঠন করে, এবং নিরাশায় আশা, শোকে সান্ত্বনা, নিরুৎসাহে উৎসাহ প্রদান করিয়া চির সহচরের ন্যায় দুর্ব্বল মানবজীবনে শক্তি ও সাহস উদ্দীপন করে। এই জন্য সুসভ্য দেশ মাত্রে ইতিহাসের এত আদর, এবং এই জন্য ইংরেজী সাহিত্যে ইতিহাসের এত উচ্চ সম্মান। কিন্তু আমাদের দেশে কোন দিন ইতিহাসের উপযুক্ত আদর ছিল না। এক্ষণও আমরা উহার সমুচিত সম্মান করিতে শিক্ষা করি নাই। বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে যে

সকল সাহিত্যগ্রন্থ অধীত হয়, তাহার অধিকাংশই পৌরাণিক উপাখ্যানাদি হইতে সংগৃহীত। সাহিত্যরূপে প্রকৃত ইতিহাস পাঠে যে মহৎ ফল লাভ, যত্ন বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অদ্যাপি তাহাতে বঞ্চিত রহিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইবে মনে করিয়াই আমি এই অভিনব প্রণালী অবলম্বনে সাহসী হইয়াছি।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনের আরও একটী উদ্দেশ্য আছে। অধুনা কতিপয় সুযোগ্য লেখকের গুণে বাঙ্গালাভাষায় একটী অভিনব তাড়িতবেগ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের সতেজ ভাষা, অভিনব চিন্তা ও পবিত্র দেশানুরাগের সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্য দিন দিন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এ দেশীয় তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থী-দিগের অন্তঃকরণে এই সকল সজীব চিন্তা ও বিশুদ্ধ দেশানুরাগ প্রবিষ্ট হয়, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহারা গৃহে যে ভাবে এই নূতন সাহিত্য অধ্যয়ন করে, তদ্দ্বারা তাহাদের শিক্ষা সুনিয়মিত হয় না। সুশিক্ষকের সাহায্যে ঐ সকল সজীব ভাষা, ভাব ও দেশহিতৈষণা তাহাদের তরল হৃদয়ে সুপ্রণালীক্রমে অঙ্কিত হইলে ভবিষ্যতে প্রচুর ফললাভের সম্ভাবনা। অপিতু চরিত্রের দৃঢ়তা, মনে মহত্ত্ব এবং কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা উপার্জ্জন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। যেরূপ গ্রন্থ সেই লক্ষ্য সাধনের অধিকতর উপযোগী বিদ্যালয়ের জন্য তাদৃশ গ্রন্থ নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। বঙ্গভাষায় এইরূপ গ্রন্থের যে অল্পতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ লেখকগণের বিরচিত কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সঙ্কলন পূর্ব্বক এই "ঐতিহাসিক সন্দর্ভ" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থে আর্য্য জাতির ভারতবর্ষে আগমন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন পর্য্যন্ত সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনামূলক কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রস্তাব সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের গ্রন্থাবলী হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিষয়ে তিনি যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাকে অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব। প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, ডাক্তার রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকটও আমি আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বালকশিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য সংগৃহীত প্রস্তাব গুলির কোনও কোনও স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইয়াছে। এই সকল রচনার উপর হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই, ভরসা করি উদারচিত্ত লেখক মহোদয়গণ আমার এই অনধিকার চর্চ্চাজনিত দোষ ক্ষমা করিবেন।

ময়মনসিংহ জেল স্কুল
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক
শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

তৃতীয় সংস্করণ।

ঐতিহাসিক সন্দর্ভে যে সকল প্রস্তাব সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা কোন কোনটী উপন্যাস বিশেষ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়, উহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক নয়, কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় প্রণীত জীবন সন্ধ্যা ও জীবন প্রভাত হইতে যে কয়েকটী প্রস্তাব সংগৃহীত হইয়াছে, যদিও তাহাতে বর্ণনার চমৎকারিত্ব রক্ষার অনুরোধে ক্বচিৎ কল্পনার ঈষৎ ছায়া পতিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত ইতিহাসের কিছুই অপচয় ঘটে নাই। পৃথুরায়ের দুর্গ দর্শন করিয়া শিবজী বলিতেছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া শিবজীর মুখে প্রকৃত ইতিহাসই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে "শিবজী বলিতেছেন" ইহা কল্পনামূলক বটে, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটী কথাও কল্পনামূলক নহে; উহার প্রত্যেক বাক্যই প্রকৃত ইতিহাসমূলক। সেইরূপ জয়সিংহ ও শিবজীর কথোপকথনস্থলে মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং শিবজী কেন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ কল্পনায় প্রকৃত ইতিহাসের অপলাপ হয় না। বরং উহাতে বর্ণনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং বর্ণিত বিষয় পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।

তথাপি, এই পুস্তকের যে দুই একটী প্রস্তাবে কল্পনার কিঞ্চিৎ বাহুল্য ছিল, বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল। একটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত এবং যত্নের সহিত ইহার সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জিত ও সংশোধিত হইল। ইহাতে একটীও অস্বাভাবিক বা অমানুষিক বর্ণনা স্থান পায় নাই; তবে বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও বর্ণনার কৌশল রক্ষার জন্য, যে যে স্থানে কল্পনার আভাস মাত্র পরিরক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ তাহাতে সাহিত্য শিক্ষার কোনও অপচয় ঘটিবে না। এবং প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ভ্রান্ত সংস্কার উপস্থিত হইবে না।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে, আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রতি লোকের দিন দিন আদর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐতিহাসিক সন্দর্ভ প্রচারিত হওয়ার পর এই প্রকৃতির দুই তিন খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও এই শ্রেণীর গ্রন্থ অধ্যাপনার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ যে উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বথা নিষ্ফল হয় নাই। সঙ্কলয়িতার পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। যাঁহাদিগের প্রসাদে এই পুস্তক এতদূর আদর ও সফলতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অলমতি পল্লবিতেন।

ময়মনসিংহ জেলাস্কুল,
২০এ বৈশাখ। ১৮০৭ শক। } শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯
প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য—তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮
প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্য—রমেশচন্দ্র দত্ত ২১
হিন্দুসভ্যতার কয়েকটী অভাব—রমেশচন্দ্র দত্ত ২৪
উদ্দীপনা—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৮
শাক্যসিংহ—রামদাস সেন ৩২
অশোক—রজনীকান্ত গুপ্ত ৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতকলঙ্ক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৮
মুসলমানবিজয়—তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৫৬
বঙ্গবিজয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬০
মুসলমানবিজয়ের ফল—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬৪
মীরাবাই—রজনীকান্ত গুপ্ত ৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হলদীঘাটার যুদ্ধ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৬
প্রতাপসিংহের পরাক্রম—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮৫
দেওয়ীরের যুদ্ধ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯৪
দুর্গাবতী—রজনীকান্ত গুপ্ত ৯৯
আকবর সাহ—তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১০৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবজী—রমেশচন্দ্র দত্ত ১১৩
শিবজীর রণচাতুর্য্য—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২২
রাজা জয়সিংহ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩১
পৃথুরায়ের দুর্গ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৪২
ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি—রজনীকান্ত গুপ্ত ... ১৪৮

ঐতিহাসিক সন্দর্ভ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পানীয়, রুশীয় প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আচার ব্যবহার অনেক দূর নিরূপণ করিয়াছেন। মৃগয়া, পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ এই তিন ব্যবসায় দ্বারা আর্য্যগণ জীবন যাপন করিত। মৃগয়াজীবী ও পালিত পশুজীবিগণ গৃহপ্রিয় ছিল না, এবং সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করিত না; ফলতঃ আধুনিক তাতার ও আরব জাতীয়গণ যেরূপ বহু পরিবার ও গৃহপালিত জীব-জন্তু-সমন্বিত হইয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ ভ্রমণপটু ছিল। কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত গৃহ-

প্রিয় ছিল, এবং স্বভাবতঃই নিজ নিজ ভূমিতে আসক্ত থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকগণ এরূপে এক স্থানে বাস করিত না; পশু-পালকগণ পশুর আবশ্যকীয় তৃণক্ষেত্র পাইবার জন্য, মৃগয়া-ব্যবসায়ী নূতন নূতন বন্য পশুর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। আর্য্যগণ স্বদেশে এরূপ ভ্রমণপটু না হইলে গঙ্গা হইতে টেম্‌স্‌নদী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত না।

এইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃই হউক, গৃহবিচ্ছেদ কারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক বা পূর্ব্বদিকে তুরেণীয় জাতিদিগের আক্রমণ কারণেই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া নূতন বাসস্থান অন্বেষণ করিত এবং বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এইরূপে গৃহনিষ্ক্রান্ত একদল আর্য্যসন্তান আধুনিক ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করে; হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি।

পরাজিত আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতি বাস করিত। ফলতঃ এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম-বাসী; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়া তাহারা উর্ব্বর প্রদেশ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। নবাগত

আর্য্যগণের সিন্ধু পার হইবার অচিরকাল পরেই এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিল, আদিমবাসিগণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই ঘৃণা করিত; এবং এই কৃষ্ণকায় শত্রুর ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সর্ব্বদাই আরাধনা করিত। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিমবাসিগণ ক্রমে পরাজিত হইল, সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আর্য্যদিগের হস্তগত হইল। বিজিত অসভ্য জাতিগণ অনেকেই আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, অবশিষ্ট অংশ অরণ্য বা পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল।

আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, আর্য্যগণ সুসভ্যও ছিল না, একেবারে বর্ব্বরও ছিল না। বর্ব্বর জাতিগণ বহু সংখ্যক মন্দপ্রকৃতি ভূত ও পিশাচে বিশ্বাস করে, সুসভ্য জাতিগণ সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যগণ বহু ঈশ্বরবাদী ছিল; প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দর বা মহৎ বলিয়া বোধ হইত তাহারই পূজা করিত। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে দ্যোঃ বলিয়া পূজা করিত, কখনও বরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। সূর্য্য ও অগ্নি আর্য্যদিগের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। এই জাতির মধ্যে কোনরূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং স্পষ্টতঃই প্রতীতি হয় যে, পুরোহিত বা পৃথক উপাসক সম্প্রদায় ছিল না; আকাশ বা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ পুরুষ পূজামন্ত্র পাঠ করিত,

এবং ফল মূল বা দুগ্ধ দান করিয়া নিজ নিজ যাচ্ঞা প্রকাশ করিত।

ভারতবর্ষে আগমনের পর এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যকেই সমধিক পূজা করিত। ইন্দ্র আকাশের দেবতা; তিনি সোমরস পান করেন এবং মনুষ্যের উপকারের জন্য সর্ব্বদাই বৃত্র ও পণি প্রভৃতি অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। অগ্নি অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিয়া যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সূর্য্য মনুষ্যের হিতার্থ আলোক বিতরণ করেন। ফলতঃ হিন্দু-ধর্ম্ম এক্ষণে যে আকার ধারণ করিয়াছে, সিন্ধু-তীরবাসী আর্য্যগণের নিকট সে আকারে পরিচিত ছিল না। স্থান, কাল ও সভ্যতা অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। কালের ও সভ্যতার গত্যনুসারে সিন্ধু-তীরবাসী আর্য্যদিগের সরল প্রকৃতিপূজা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাসে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে।

আদিম হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতাও ছিল না। আরাধনাপদ্ধতি সরল ছিল; উপাসক ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দান করিতেন, নিজের বা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন, গোবৎস বৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন, অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজা নির্ব্বাহার্থ এক এক জন পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পূজকের গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না। প্রথম হিন্দু-

দিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম, এইরূপ সরল পূজা ও সরল বিশ্বাস ছিল।

কালক্রমে অনেক ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সমাজের প্রথমাবস্থায় সকলেই যেরূপ কৃষি-কার্য্য, মেষপালনকার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করে, পরে সেরূপ থাকে না; প্রতি ব্যবসায় অবলম্বনকারী লোক এক একটী ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। হিন্দুদিগের সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এই ঘটনা ঘটিল। জগতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, ভারত-বর্ষেও সেইরূপ পূজকগণ একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল, ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিল, ক্রমে পূজাসম্পাদন কার্য্য একচাটিয়া করিয়া লইল; সুতরাং আর কেহ ব্রাহ্মণকে না ডাকিয়া নিজের পূজা নিজে সম্পাদন করিতে পারিত না। পরা-ক্রান্ত গর্ব্বিত যোদ্ধা ও রাজগণও সামান্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল এবং ক্ষত্রিয় নাম ধারণ করিল। সামান্য কৃষি বা বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ যোদ্ধা বা পূজক-দিগের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইত না; তাহারা একটী অধীন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বৈশ্য নাম ধারণ করিল। পরাজিত কৃষ্ণ-কায় অসভ্যগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-সন্তানদিগের দাস হইয়া রহিল।

এই জাতিবিচ্ছেদ সহসা বা এক দিনে সম্পাদিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া এই বৃহৎ ঘটনাটী সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথম রচিত ঋগ্বেদের সংহিতায় চারি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের

উল্লেখ মাত্র স্থানে স্থানে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য শেষ রচিত বেদে উপরি উক্ত চারি জাতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু জাতিবিচ্ছেদ সম্পাদিত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র বিষয়ক প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিত না, ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়দিগের শস্ত্র বিষয়ক প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিত না। উপনিষদের অনেক স্থানে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, ব্রাহ্মণগণ বিনীত ভাবে তাহাই শিখিতেছে, এরূপ লিখিত আছে। পক্ষান্তরে পরশুরামের উপাখ্যান হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে অনেকবার পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত বিরোধ লোপ পাইল, এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ নির্ণীত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্য ব্যবসায়ে উৎকর্ষ বা প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিল। এই জাতিবিচ্ছেদ স্বরূপ ভিত্তির উপর হিন্দুদিগের নব্য সমাজ সংস্থাপিত হইল।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। প্রত্যেক বেদে সংহিতা অর্থাৎ আরাধনার সরল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আড়ম্বর পরিপূর্ণ পূজার রীতি পদ্ধতি, এবং উপনিষদ্ অর্থাৎ চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই তিন অংশ আছে। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদের সংহিতা পরিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের সংহিতা প্রণীত হয়, এবং ক্রমে চারি বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচিত হয়।

যে সময়ে আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধুতীরে আসিয়া বাস করিল,

যখন তাহাদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না, যখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দিয়া নিজের বা পরিবারের কুশলের জন্য বা গোবৎসাদির বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র বা অগ্নি বা সূর্য্যকে সরলচিত্তে আরাধনা করিত, তখন ঋগ্বেদের সরল ও কবিত্বপূর্ণ সংহিতা রচিত হয়। এই সময়ে আর্য্যদিগের জাতীয় জীবনে বিশেষ বল লক্ষিত হয়। বেদের সংহিতা সেই বলের ছায়া মাত্র। সেই বলে বহু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, মেষপালক সমাজ ক্রমে জাতি-বিচ্ছেদ-মূলক সভ্য হিন্দুসমাজ রূপ ধারণ করে।

পরে যখন জাতিবিচ্ছেদ হইল, যখন পূজক বা ব্রাহ্মণ জাতি প্রাধান্য লাভ করিল, যখন আড়ম্বরপূর্ণ পূজার বৃদ্ধি হইল ও ধর্ম্মান্ধতা বৃদ্ধি পাইল, তখন বেদের ব্রাহ্মণ অংশ রচিত হইল। ব্রাহ্মণ অংশে কবিত্ব নাই, সরলতা নাই, চিন্তা নাই, মানসিক ক্ষমতার পরিচয় নাই, কেবল আড়ম্বর! পূজক প্রাধান্যবৃদ্ধির সহিত জাতীয় জীবন ক্ষীণবল হইল ও চিন্তা-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আর্য্যজাতির নূতন ও স্বাস্থ্যকর উন্নতি পূজকপ্রাধান্য ও ধর্ম্মান্ধতা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পূজকপ্রাধান্য অধিক দিন রহিল না। বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিল, তাহার প্রমাণ আছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে যেরূপ পূজক-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তৎপর রচিত উপনিষদ অংশে সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষদের অনেক অংশে ক্ষত্রিয়গণ

দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় জাতীয় চিন্তার পরিচয় দিতেছে, এরূপ দেখা যায়। কিন্তু কেবল শিক্ষা ও চিন্তায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছিল এরূপ নহে, যে জনক রাজা উপনিষদের একজন প্রধান শিক্ষা-গুরু তাঁহার জামাতা রাম-চন্দ্র ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিনষ্ট করেন, পরে দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বল ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। রামচন্দ্রের আখ্যান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ আখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, জনক রাজা ও উপনিষদ্ রচনার সময়ে অর্থাৎ বেদ-বর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রবলে ব্রাহ্মণবলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করে।

এই সময়ে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের আরও প্রমাণ আছে। কুরু-ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়বলের পরিচয় দিতেছে। সকলেই জানেন যে, বেদব্যাসের জীবিত কালেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়; বেদব্যাসের গল্প প্রকৃতই হউক বা নাই হউক, দ্বৈপা-য়ন বেদব্যাস নামে কোন লোক থাকুন বা নাই থাকুন, এই জনশ্রুতি হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে কালে বেদ রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সেই কালেরই শেষভাগে ক্ষত্রিয়বলের অপরি-সীম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বেদবর্ণিত কালের শেষ অংশে ক্ষত্রিয়বল ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়বলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অস্ত্রবল বিকাশ পাইয়া-ছিল, আর্য্যদিগের জাতীয়-জীবন উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং

অনার্য্য দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া আর্য্যগৌরব প্রসারিত হইয়াছিল, এইরূপে হিন্দু জাতীয়জীবন দ্বিতীয়বার উৎকর্ষ লাভ করে; উপনিষদ্, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার ছায়া মাত্র।

বহুকাল পরে একজন ক্ষত্রিয় পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন ও মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বুদ্ধের সেই শিক্ষাবলে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতি সোপানে উঠিতে লাগিল। এই বৌদ্ধকালে অশোক আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় একছত্র করিলেন, এই কালে যড়্দর্শন ও চিন্তাশক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল, এইকালে হিন্দু নাবিকগণ বঙ্গসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জাবা দ্বীপের আবিষ্কার করিল এবং এই কালে শিল্পবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ অট্টালিকা ও শিল্পকার্য্যে আচ্ছাদিত করিল। হিন্দুজাতির চিত্ত এই তৃতীয়বার আলোড়িত হইল।

পরে যখন খ্রীষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন চিন্তাক্ষমতা পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিল, সমগ্র ভারতবর্ষে চিন্তাস্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইটী ব্রাহ্মণপ্রবর্ত্তিত বিপ্লব, এই বিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ধীশক্তি, কল্পনা ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিন চারিশত বৎসরের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্র পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চীনভ্রমণকারী ভারতবর্ষের অর্থ ও সভ্যতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাগর

মন্থন করিয়া অসংখ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, বেদান্তদর্শনের নূতন রূপ দান করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরই ভাস্করাচার্য্য লীলাবতী ও বীজগণিত প্রণয়ন দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। তাহার পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করকবলিত হইল, হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত হইল; সেই অবধি হিন্দুদিগের মানসিক বেগের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অতিশয় অসম্পন্ন ও কল্পিত উপন্যাসে কলুষিত সত্য বটে, তথাপি আদিম কালের হিন্দুকুলের অভ্রান্ত-দর্পণ-স্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে। তৎসমুদায়ে আদি পুরুষদিগের যেরূপ চরিত প্রতিবিম্বিত হয়, অধুনা হিন্দুদিগের মধ্যে তাহার অধিক অনুকৃতি দেখা যায় না। প্রাংশু ও বামনে, বলী ও ক্ষীণে যত বৈলক্ষণ্য, আদিম ও আধুনিক হিন্দুতে তদপেক্ষাও অধিক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্য-বংশের সাহসিকতা, বাঙ্‌নিষ্ঠা, সারল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন; অধুনা হিন্দুদিগের ঐ সকল গুণের অভাবই প্রধান রূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন হিন্দুরা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া সময়ে সময়ে তাতার, চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের জয় পতাকা উড্ডীন করিতেন; অধুনা বহু দূর হইতে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের কতিপয় সৈনিক

আসিয়া ভারতভূমির উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে। তখন হিন্দুরা স্বজাতীয় ভিন্ন সকলকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন; অধুনা সেই ম্লেচ্ছেরা আসিয়া আর্য্য-সন্তানগণের উপরে নিয়ত অবজ্ঞা বর্ষণ করিতেছে। তখন হিন্দুদিগের অর্ণবতরি স্থমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে নিয়ত গতায়াত করিত, অদ্যাপি জাবার সন্নিহিত বালি দ্বীপে তাহার ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; অধুনা সমুদ্র গমনের নামেই হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং কেহ কোনরূপে যাইলে তিনি সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া আইসেন। ফলতঃ ইদানীন্তন হিন্দুরা শৌর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে আদি পুরুষদিগের অপেক্ষা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছেন।

শৌর্য্যাদির হ্রাসের সহিত সামাজিক ব্যবস্থাতেও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। অধুনা হিন্দু-সিমন্তিনীগণ দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত, বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ ও ইতর জন্তুর ন্যায় নিরক্ষর দৃষ্ট হয়। কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অবলোকন করিলে স্ত্রীদিগকে আদরণীয়, শিক্ষণীয় ও অনেক পরিমাণে অনবরুদ্ধ দেখা যায়। তখন বাল্যবিবাহ কোথায়! কেহই চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়সে দারপরিগ্রহ করিতেন না। আর স্বয়ংবরের প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, স্ত্রীদিগেরও অধিক বয়সে বিবাহ হইলে কেহই চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়-গমনের বিভীষিকায় ভীত হইতেন না। কিন্তু তখন শূদ্র-দিগের প্রতি অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল, অধুনা তাহার অনেক শৈথিল্য হইয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বকালে যখন সমুদায় মেদিনী ঘোর মূর্খতা-রজনীতে

আচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারতবর্ষে বিদ্যার নির্ম্মল আলোক কোনরূপেই নিষ্প্রভ ছিল না। তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্রে অতি আদিমকালে যে সকল মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তৎসমুদায় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আদিম হিন্দুদিগের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাঁহারা বিষুবসংক্রান্ত তাবৎ তত্ত্ব এবং গ্রহণের প্রকৃত হেতু অবগত ছিলেন; গ্রহণ গণনারও উৎকৃষ্ট সঙ্কেত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। আদিম বুধগণের মধ্যে কেহ কেহ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন আবিষ্কার করেন এবং কেহ কেহ অপরিস্ফুটরূপে মাধ্যাকর্ষণেরও প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। বীজগণিত-শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুরা অনেক আবিষ্ক্রিয়া করেন এবং সেই সকলের কোন কোন তত্ত্ব পরশ্বঃ মাত্র ইউরোপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলেই হয়। ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রেও তাঁহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ঐ শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ইউরোপের যাবতীয় বিদ্যার আদিম উদ্ভাবক গ্রীকজাতিও হিন্দুদিগের অপেক্ষা বিস্তর ন্যূন ছিল। এমন কি, বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে তাহার অনেক তত্ত্বের বিন্দুবিসর্গও বিদিত ছিল না। পাটীগণিতে হিন্দুরাই দিগ্‌দিগন্তরব্যাপিনী দশগুণোত্তর অঙ্কলিখন-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন।

দর্শন ও গণিতে প্রাচীন হিন্দুরা যতদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তর্ক ও শব্দ শাস্ত্রে তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। আর ভাষাবিদ্‌দিগের মতে সংস্কৃতের ন্যায় সুশ্রাব্য, সুললিত ও সুস-

স্পন্ন ভাষা ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। ব্যাকরণের যতদূর নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য সম্ভব, এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে তত্তাবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন ভাব নাই যাহা ইহাতে প্রকাশ করা যায় না। ইহার ছন্দোমঞ্জরীতে অশেষবিধ ছন্দশ্চাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবংবিধ ভাষা পাইয়া সুনির্ম্মল-মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন হিন্দুরা যে বিস্তর মধুর কাব্য রচনা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধুনা বহ্বায়ত সমুদ্র অতি-ক্রম করিয়া সংস্কৃত কাব্যের যশঃসৌরভ জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে; এবং ইহা সাহসপূর্ব্বক বলাযাইতে পারে যে, যাবৎ মানবকুলের কাব্যরসে স্বাদ ও আস্থা থাকিবে, তাবৎ বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুল কখনই বিস্মৃত বা অনাদৃত হইবেন না।

প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্য।

(কাব্য)

কবিত্ব ও কল্পনা শক্তিতে হিন্দুদিগের সমতুল্য জাতি জগতে এ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাঁহাদিগের অসাধারণ কবিত্ব ও অনন্ত কাব্যের সম্যক্ সমালোচন এই অল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবে না, সুতরাং আমরা কেবল কয়েকটী প্রধান প্রধান কাব্যের উল্লেখ করিব।

ঋগ্বেদের সংহিতা ভারতবর্ষে এবং বোধ হয় জগতের মধ্যে আদিকাব্য। ইহার পূর্ব্বেও কবিতা ও গীত রচিত হইয়া-ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ পূর্ব্ব রচিত কোন কাব্যের এক্ষণে নিদর্শন পাওয়া যায় না। [illegible] স্থানে

স্থানে অতিশয় মনোহর; সরল পবিত্র অন্তঃকরণে ও ভক্তিভাবে আর্য্যগণ সূর্য্য বা ঊষা বা অগ্নিকে যে আহ্বান করিতেন তাহা পাঠ করিলে এখনও হৃদয় আলোড়িত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে কবিত্ব অধিক নাই, উপনিষদ্ কেবল বিজ্ঞানচিন্তা ও তর্কে পরিপূর্ণ।

তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত নামক যে দুইটী মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার তুল্য কাব্য বোধ হয় জগতে আর নাই। ইহাতে যে উদ্ভাবনশক্তি, যে বর্ণনাশক্তি, যে মধুরতা, যে করুণ ও বীররস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এস্থানে সম্যক্ বর্ণনা করা যায় না। বৃদ্ধ, শোকার্ত্ত দশরথের চিত্র, পতি-পরায়ণা সীতার জীবনব্যাপী শোক, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সত্যপ্রিয়তা ও বীরত্ব প্রভৃতি রামায়ণে যে কতকগুলি অপূর্ব্ব চিত্র আছে, সেরূপ মনুষ্যকল্পনা হইতে বোধ হয় আর কখনই আবিষ্কৃত হয় নাই। মহাভারতেও সেইরূপ হৃদয়-গ্রাহী বিস্ময়কর কয়েকটী চিত্র আছে; ভীষণ অভিমানী দুর্য্যোধন, ক্রুর গর্ব্বিত তেজঃপূর্ণ কর্ণ; প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রশান্তহৃদয়, ভক্তি-ভাজন, জগতে অতুল্যবীর পিতামহ ভীষ্ম; অসাধারণ তেজস্বী যুদ্ধাচার্য্য দ্রোণ; সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ; চতুর অস্ত্রজ্ঞ অর্জ্জুন; শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির; পরাক্রান্ত, সরল স্বভাব ভীম; এই এক একটী রত্ন;—কল্পনাসাগর হইতে এরূপ রত্ন আর কখনও উদ্ধৃত হয় নাই।

মহাভারতের পর যে অসংখ্য কাব্য রচিত হইয়াছে, এস্থানে সে সমস্তের উল্লেখ করাও অসম্ভব। সুতরাং আমরা কেবল প্রধান দুইটী কবির বিষয় উল্লেখ করিব; সে দুইটী

ভারতের শিরোরত্ন স্বরূপ ;—কালিদাস ও ভবভূতি। কালিদাসের নাটক মধ্যে শকুন্তলার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত নাটক আর একটীও নাই; আমাদের মতে এ প্রকার সুললিত মধুর নাটক জগতেও আর নাই। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন সে মধুরতা পুস্তকে ধরে না, যেন পত্রে পত্রে পংক্তিতে পংক্তিতে উথলিয়া পড়িতেছে। কণ্ব মুনির শান্ত আশ্রমে বল্কলবাসিনী শকুন্তলা, তাঁহার বন্য সঙ্গিনীগণ, হরিণী, বন্যলতা, পুষ্পচারা, অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা, তাঁহার সরল শান্ত হৃদয়ের প্রথম অজ্ঞাত অব্যক্ত উদ্বেগ, তাঁহার চিরসঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে খেদপূর্ণ বিদায় গ্রহণ প্রভৃতি যে সমস্ত চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত আছে, সেরূপ ললিত, মধুর, হৃদয়গ্রাহী চিত্র আমরা কখনও কোন ভাষায় দৃষ্টি করি নাই। শকুন্তলা ভিন্ন কালিদাসের আর দুইটী নাটক এখনও বিদ্যমান আছে, সে দুইটী বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র। এই দুইটীতে, বিশেষতঃ বিক্রমোর্ব্বশীতে, কালিদাসের কল্পনার অতুল্য লীলা, কালিদাসের লেখনীর অসাধারণ মধুরতা দৃষ্ট হয়।

নাটক ভিন্ন কালিদাস অন্য কাব্যও কতকগুলি লিখিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কালিদাস রচিত, ঋতুসংহার ও নলোদয় কালিদাসের কি না সন্দেহ। রঘুবংশে রাজাদিগের কীর্ত্তি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; কুমারসম্ভবে উমার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে মহাদেবের তপঃ ও উমার সেবা, পরে নির্জ্জন বনে উমার কঠোর তপস্যা ও শোক অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে; মেঘদূতে দেশ বর্ণনার চতুরতা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ভবভূতির মালতীমাধব অতি প্রসিদ্ধ নাটক। কালিদাসের লেখনী যেরূপ মধুময়ী, মালতীমাধব রচয়িতার লেখনীও সেইরূপ তেজীয়সী। বিশেষতঃ চামুণ্ডার মন্দিরে মালতীকে যখন বলি দিবার উদ্যোগ হইল,—মাধব যখন ভীষণ যুদ্ধের পর অঘোরঘণ্টাকে নিহত করিয়া মালতীর উদ্ধার করেন, সেই স্থানের বর্ণনার ন্যায় তেজীয়সী ভয়াবহ বর্ণনা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। এইটী ভিন্ন ভবভূতি আর দুইটী নাটক লিখিয়াছেন। মহাবীরচরিতে রামরাবণের যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধারের বর্ণনা আছে, উত্তর রামচরিতে সীতার বনবাস বর্ণিত হইয়াছে; দুইটীই হৃদয়গ্রাহী, তন্মধ্যে শেষটী বিশেষ করুণরসপূর্ণ।

কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ ভিন্ন ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, শ্রীহর্ষের নৈষধ ও ভট্টিকাব্য প্রসিদ্ধ। নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, বাসবদত্তা, মুদ্রারাক্ষস ও বেণীসংহার প্রসিদ্ধ আছে। গদ্য কাব্যের মধ্যে কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রসিদ্ধ, এবং গীতি কাব্যের মধ্যে গীতগোবিন্দ বিখ্যাত। অষ্টাদশপুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু তাহার বর্ণনা এ স্থলে সম্ভবে না।

হিন্দু-সভ্যতার কয়েকটী অভাব।

যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের চিন্তাক্ষমতা ও কবিত্বশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা সেই জাতির ভাস্করকার্য্য ও গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে দুর্ব্বলতা দেখিয়াও সেইরূপ বিস্মিত হয়েন। ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত মন্দির,

দেবালয় ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ, এলোরা ও এলিফাণ্টার গহ্বরে এবং উড়িষ্যার খন্দগিরিতে যে অসংখ্য প্রস্তরের খোদিত মূর্ত্তি আছে, সে সমস্ত যে কত পরিশ্রমে সাধিত হইয়াছে, তাহা অনুভব করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু এই অসংখ্য মূর্ত্তি ও হর্ম্ম্যাদির মধ্যে কোনটীও চিন্তা বা বিশেষ কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয় না কি জন্য? গ্রীক্ ও রোমীয়দিগের ন্যায় হিন্দুগণ সুন্দর কমনীয় প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই কি জন্য? কাব্যে শকুন্তলার যে অতুল্য মিষ্টত্ব ও কমনীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, ভাস্করকার্য্যে সে মিষ্টত্ব কোথায়? চিন্তা ও কল্পনা হিন্দুর কবিত্বে বর্ত্তমান আছে, ভাস্করকার্য্যে বা হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণে বর্ত্তমান নাই কি জন্য?

ইহার কারণ অনুভব করা দুঃসাধ্য। আমাদিগের বোধ হয় জাতিবিচ্ছেদ ইহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের প্রভু, মিশ্রজাতিগণ তাঁহাদিগের অধীন, তাহারা কখনও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে নাই, ভরসাও করে নাই। স্বাধীনতা ও পরাক্রমের সহিত মনোবৃত্তিগুলি স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, অধীনতায় সেগুলি নিহত হইয়া যায়। স্বাধীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ চিন্তা ও অস্ত্রব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এবং সেই সেই বিষয়ে যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন, জগৎ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। পদ-দলিত হীন মিশ্রজাতিগণ শিল্প কার্য্য অবলম্বন করিল, বৎসরে বৎসরে যুগে যুগে ব্রাহ্মণাদেশে সেই কার্য্য করিতে লাগিল; কিন্তু মনের স্বাধীনতা নাই, হৃদয়ের বেগ নাই, সেই অসংখ্য কার্য্যে কল্পনার পরিচয় নাই। ব্রাহ্মণাদেশে তাহারা মন্দির ও

দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, রাজাদেশে প্রাসাদ, দুর্গ ও প্রাচীর প্রস্তুত করিত, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনে মনের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইল না। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে শিখিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা মন্দির প্রস্তুত করিতে শিখিল, কিন্তু সে কার্য্যে বিশেষ কল্পনা বা চিন্তার পরিচয় নাই।

সকল দেশেই বিদ্যা ও অস্ত্রব্যবসায়ী লোক অন্য লোক অপেক্ষা প্রভুত্ব লাভ করে; কিন্তু সেই প্রভুত্বটী বংশানুগত হইলে অনিষ্ঠ ফল ফলে। সমাজের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে; সামান্য ব্যবসায়ী লোকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে নিকৃষ্ঠ বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে না; উচ্চব্যবসায়ী লোক জন্মহেতুই আপনাদিগকে উৎকৃষ্ঠ বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং নীচ লোকদিগের উপর অত্যাচার করে, আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষার জন্য অন্যায় উপায় উদ্ভাবন করে। ইউরোপে যে সমস্ত আবিষ্কার দ্বারা আধুনিক সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি অতি সামান্য লোকে করিয়াছে; ভারতবর্ষে সেটী নিষিদ্ধ; কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে সামান্য লোকের চিন্তাশক্তি বা কার্য্যনৈপুণ্যের চিহ্ন মাত্র নাই। স্বাধীনতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের একচাটীয়া; স্বাধীনচিন্তা নিম্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ! যে বিদ্যা জীবনের জীবন স্বরূপ এবং ক্ষমতার মূলীভূত কারণ স্বরূপ, তাহাও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে নিম্ন জাতিদিগের নিকট হইতে, পরে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন; বিদ্যাহীন নিম্ন জাতিগণ সুতরাং পদানত হইয়া পড়িল, তাহাদিগের মানসিক উন্নতির পথ রহিল না।

এক জাতি প্রভু ও অন্য জাতি দাস হইলে কেবল যে দাস জাতির অমঙ্গল হয় তাহা নহে, প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকাতে সত্যের জন্য ততটা উৎসাহী ছিলেন না; জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রে যতদূর উন্নতি সম্ভব ছিল, ততদূর হইয়া উঠিল না। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টায় প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হ্রাস পাইল। ফলতঃ জাতি বিচ্ছেদ ও ধর্ম্মান্ধতায় হিন্দু-সভ্যতা ও বিদ্যার গতি অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার আর একটী অভাব আমরা এই স্থানে নির্দ্দেশ করিব। হিন্দুদিগের সকল বিদ্যায় সমান অধিকার ছিল না। স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও কল্পনাপটু থাকিয়া তাঁহারা সামান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই; আকাশের নক্ষত্র গণিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীর জীব বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা করেন নাই, দেবদেবীর উপন্যাস রাশীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের কথা লিখেন নাই, আপনাদিগের একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। এই সামান্য বিষয়ে দৃষ্টি আধুনিক সভ্যতার মূলীভূত কারণ; বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, পাত্র হইতে ধূম উঠিতেছে, এইরূপ সামান্য বিষয়ই আধুনিক বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার কারণ।

উদ্দীপনা।

প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার এই আর একটী অভাব ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই একটী ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনা-শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস বা কাইকিরো * আমাদের একজনও ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইয়ুরোপে "এলোকোয়েন্স" † বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদের ছিল না। কবিত্বশক্তি ও উদ্দীপনা শক্তি দুইটী যে ভিন্ন, একথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। আপাততঃ দৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুই জনে কালে দুই বিভিন্ন গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুই জনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে।

উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডাকিয়া কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রসোদ্ভাবন, অন্যকে কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটী না একটী তাঁর চির উদ্দেশ্য। তিনি নিজ মন হইতে একটু রস তোমার

---

* ডিমস্থিনিস—এথেন্স নগরে ৩৮১ পূঃ খৃঃ জন্ম, ৩২২ পূঃ খৃঃ মৃত্যু, গ্রীস দেশীয় সর্ব্ব প্রধান বাগ্মী। ফিলিপ যখন রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হন তখন ইঁহার বক্তৃতাগুণে গ্রীসবাসিগণ অগ্নিময় হইয়া উঠে। আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তী এন্টিপেটার ডিমস্থিনিসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য গ্রীস দেশীয়দিগকে যাচ্ঞা করিলে ডিমস্থিনিস বিষপান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

কাইকিরো বা সিসিরো—১০৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্ম, ৪৩ পূঃ খৃঃ মৃত্যু। রোমীয় সর্ব্ব প্রধান বক্তা ও বিজ্ঞানবিৎ। ইনি রাজনৈতিক চর্চ্চায় বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

† এলোকোয়েন্স—বাগ্মিতা।

মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয় ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে; উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকে ডাকেনও না, নিজে হাত তুলিয়া কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি যেন, বসন্ত-সন্ধ্যা-বাতান্দোলিতা, যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। চতুর্দ্দিক্ গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ করিল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কি না, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবা মাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার নয়ন তৃপ্ত হইল; তোমার মানস মোহিত হইল; তুমি চরিতার্থ হইলে। কিন্তু লতার তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জ্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি, আর অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্ব্বকালে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ কবি ছিল, একজনও উদ্দীপক ছিল না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত এমন নির্জ্জনস্পৃহ জাতি—এমন নির্জ্জনচিন্তাস্পৃহ জাতি, বোধ হয় পৃথিবীতে আর ছিল না, এখনও বোধ হয় আর নাই। এবং

এই জন্যই এত কবি—প্রকৃত কবি-পদবাচ্য কবি, এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই, আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভাল মন্দ মিশ্রিত; সুখ দুঃখ জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে। এক দিকে কিছু অধিক লাভ হইয়াছে কি অন্য দিকে সেই পরিমাণে না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। যাঁহার উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী সরস্বতী তাঁহার দিকে প্রায় চাহিয়া দেখেন না! লক্ষ্মী আবার তেমনি সপত্নী-বর-পুত্রদিগের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোরাশি মানধন পণ্ডিতপ্রবর অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা লইয়া বিব্রত; দাস দাসী পরিবেষ্টিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্না সুশীলা সতী মাদক-সেবনশীল উদ্ধত স্বামীর নিগ্রহে দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতেছেন। বস্তুতঃ জগতের একটী বিচিত্র কৌশলই এই, যদি এক দিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয়ই আর এক দিকে কিছু বেশী আছে।

আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল; সেই জন্যই একজনও উদ্দীপক ছিলেন না, উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জ্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না থাকার কারণ। ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জ্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল মন্দ উভয়ই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে, গৃহে, আচরণে সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্ত্তা। বাস্তবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজন-শাসন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন।

তাঁহাদের কিছুরই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই; উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি ছিলেন, তাহা ভারতের যাহা কিছু পর্য্যালোচনা করিবে, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজভাগ দেখ; ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন; বিবেচনা করিলেন, পরামর্শ দিলেন, ব্যবস্থা করিলেন; ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে অভ্যন্তর রক্ষা করিলেন; বৈশ্য বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিলেন; শূদ্র পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটী খণ্ড দেশ লইয়া যেমন একটী দেশ, তেমনি চারিটী জাতি লইয়া একটী হিন্দুজাতি হইল। ঠিক্ যন্ত্রের মত সমুদায়। ব্রাহ্মণশিশু আট বৎসর বা দশবৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলেন; উপনয়ন হইল; সেইটী তাঁহার বিদ্যারম্ভ, তিনি তখন ব্রহ্মচারী। কেহ বার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদী স্রোতের ন্যায় জীবন স্রোত! পিতা মাতার অনুকরণ করিলেই শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইল। যুক্তিও তাহার বিপরীতে কিছুই বলিতে পারিত না, সুতরাং যুক্তি সঙ্গতও হইল। সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে দেখ, বসুন্ধরা ভূরি শস্য-প্রসূতি, খনি রত্নগর্ব্ভা। কথায় বলে পৃথিবীর সকল জিনিষের নমুনা ভারতে আছে। পূর্ব্বকালে যে সেইরূপ ছিল তাহার আর

সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই, প্রয়োজন নাই, সুতরাং কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। যাহার কাহাকেও কিছু বলিতে না হয়, তাহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে। তিনি কবি হইলে হইতে পারেন; কেন না, মানব যদি কুশিক্ষায় অরসিক বা অভাবুক না হইয়া থাকে, তাহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম্ম। উদ্দীপনা সেরূপ নহে। ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে পরিণত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়।

—— ০ ——

শাক্য সিংহ।

এই ভারতবর্ষ অতি পুণ্যভূমি ও অপূর্ব্ব স্থান। যখন আর্য্য-কুলতিলক ঋষিগণ পুণ্যাশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতানে সমস্বরে সেই অনাদি দেবতার স্তুতিবাদ করিতেন, আর সাম-গানে তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেন, তখনকার কি অপূর্ব্ব ভাব ছিল! যখন নৈমিষারণ্যে শ্বেতশ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধচেতা মুনিগণ ভগবদ্ভক্তি রস পান করিতে করিতে ভক্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করিতেন, তখনকার কি স্বর্গীয় ভাব! মনে হইলে চিত্ত আনন্দনীরে অবগাহন করে। কিন্তু কাল প্রভাবে সকলই বিলুপ্ত হইল। পরিশেষে ব্রাহ্মণ জাতি প্রাধান্য লাভ করিয়া বৈদিক শুষ্ক ক্রিয়া কলাপই ধর্ম্মের সার বলিয়া মানিতে লাগিলেন। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না।

মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং ভারতসমাজে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারস্বরূপ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদিত হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে, তথা সমাজে অভিনব প্রণালী বদ্ধমূল করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসি হস্তে উপস্থিত হইলেন।

শাক্যসিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্য বংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্যসিংহ প্রকৃত ইক্ষ্বাকু বংশীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া গোতমবংশীয় কোপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাকবৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও ঐ বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ উভয় নামে খ্যাত। শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন; মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন নেপালের সন্নিহিত কপিলবাস্তু নগরের রাজা ছিলেন। শাক্যসিংহ বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাক্যসিংহের জন্মের সপ্তদিবস পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তিনি তাহার মাতার ভগিনী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহ

অচিরকাল মধ্যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন, বালকদিগের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না; সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দর্শনে তাঁহাকে সংসারসুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী, বুদ্ধ ও আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রম পরিগ্রহ করেন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তীত্ব আর বিলুপ্ত হইবে না।

অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। রাজা নিজ নগরে প্রচার করিলেন, আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না; গুণ, সত্য ও ধর্ম্মেই কুমারের মন, ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর। অনন্তর অনুসন্ধানদ্বারা দণ্ডপাণি শাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের ইচ্ছানুরূপ গুণসম্পন্না বলিয়া অবধারিত হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্যসুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত।

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে পথিমধ্যে এক-জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাঁহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার, এ ব্যক্তি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে; তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়! মনুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথে, রথবেগ সংবরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে?

অন্য এক দিবস শাক্যসিংহ নগরের দক্ষিণ তোরণ-সম্মুখে স্বজনপরিত্যক্ত, বহুরোগগ্রস্ত, জীর্ণকলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সারথি করযোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত

কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যেরা এতাদৃশ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগরমধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে তৃতীয়বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃত শরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন-বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বৈরাগ্যের উদয় হইল।

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাসভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি রোগশোক-বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কে? সারথি কহিল, রাজকুমার, এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া আনন্দিত-চিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। রাজকুমার কহিলেন, সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ; আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন

করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজলনেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিবার জন্য নানা প্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি জরাদ্বারা আক্রান্ত না হইয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চিরকাল অবস্থিতি করে তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন। রাজা এ সকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন, পুত্র, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ-আননে পুত্রকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

একদা গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া 'অনোমা' নদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে * আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির অনুকূল কোনও শিক্ষা না পাইয়া অগত্যা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর রাজ-গৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এই স্থান হইতে পঞ্চজন

---

* বৈশালীনগর—বর্ত্তমান পাটনার উত্তরে অবস্থিত ছিল।

সহাধ্যায়ীর সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব * নামক স্থানে যাইয়া ছয় বর্ষ কাল অতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশুদ্ধ সমাধি ও মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। ক্রমে তাঁহার সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিলেন।

শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্ঞানলাভ করিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ জন সহাধ্যায়ী এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহের † বক্তৃতাকালে বহু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয়

উর্ব্বিলব বা উরুবিল্ব গ্রাম—বর্ত্তমান বুধগয়ার নিকটবর্ত্তী; এখন ইহাকে উরাইল বলে।

† বর্ত্তমান গয়ার নিকটবর্ত্তী রাজগিরি পাহাড়কে রাজগৃহ বলিত। এই নগর তৎকালে মহারাজ বিম্বসরের রাজধানী ছিল।

ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি ও নৃপতি প্রসন্নজিৎ তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবাস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে কুশী নগরে * মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

বেদবর্ণিত কালের শেষে ক্ষত্রিয়গণ একবার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয় বুদ্ধদেব দ্বিতীয় বার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বৌদ্ধগণ বেদ মানে না, জাতিবিচ্ছেদ মানে না। সকল মনুষ্যই সমান, সকল শ্রেণী হইতে পুরোহিত হইতে পারে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই মহতী শিক্ষা দান করে। এক জন্মের পর অন্য জন্ম হয়, তাহার পর পুনরায় জন্ম হয়, বৌদ্ধদিগের এইরূপ বিশ্বাস। যাঁহারা এইরূপ বহুজন্মে আপনাদিগের কার্য্য ও ধর্ম্মবলে অবশেষে নিশ্চেষ্ট নিস্পৃহ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই বুদ্ধ। এইরূপ বুদ্ধপদ অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ।

হিন্দুধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া শাক্যমুনি মনুষ্যের সমতা ও সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা প্রচার করিলেন; তাঁহার এই মহামন্ত্রে যেন ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবন বলিষ্ঠ হইল। ধর্ম্ম-বিপ্লব, চিন্তাবিপ্লব ভিন্ন আর কিছু নহে; উহাতে মনুষ্যের

---

* কুশীনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণভাগে ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল। এখন ইহার ভগ্নাবস্থা।

হৃদয় আলোড়িত হয়, পূর্ব্ব সংস্কার দূর হয়, নূতন সংস্কারের আবির্ভাব হয়, মন নব বলে বলিষ্ঠ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্ব-সাধারণ জনগণ, শাক্যমুনির মহৎ উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিল, সকল মনুষ্য সমতুল্য এই উদার বাক্যে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত হইল। ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; অনেক রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের লোপ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইল; অনেক রাজ্যে দুইটী ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যবিপ্লব ঘটিল; মনের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উৎকর্ষ ঘটিল; চিন্তার উদারতা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের উদারতা ও বিস্তার ঘটিল; অবশেষে মগধ দেশের রাজগণ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত একছত্র করিল। আর্য্যাবর্ত্ত ইহার পূর্ব্বে কখন একছত্র হয় নাই; ভারতবর্ষে এইরূপ ঐক্য সাধন বৌদ্ধধর্ম্মেরই একটী ফল মাত্র।

বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। ইয়ুরোপীয় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ, অধুনা যে সকল অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎ-সর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ ভারত-বর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের জয়ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমা-দিগকে এক্ষণে অসভ্য বা অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, সেই জাতির পিতামহ গ্রীক্‌গণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিত।

বিস্তৃত হয়, অনন্ত বায়ুরাশির উপর ভর দিয়া জগতে জগতে উড়িয়া বেড়ায়। প্রতিভাযুক্ত মন সেই আশার অনুবর্ত্তী হয়, এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার গমনমার্গ পরীক্ষা করে; তৎপর শক্তিকে সেই পরিমাণ উত্তেজিত করিয়া দুর্ব্বলের অগম্য স্থান লাভ করে। যাহার শোণিতে উষ্ণতার অভাব, কিছুতেই উত্তেজিত হয় না; ধ্রুব নক্ষত্রের অপর পার্শ্ববর্ত্তিনী অত্যুচ্চ আশার অনুগমনে অসমর্থ; সুতরাং উড্ডীয়মানা আশার পক্ষযুগে প্রস্তর বাঁধিয়া দেয়

ভারতে শক্তির অভাবে আশার অভাব, একথা নিতান্ত অলীক। চেষ্টায় আলস্য-সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভারতে নিরাশার এই মাত্র কারণ। আশার সঞ্চার হইতেই "পরিশ্রম করিতে হইবে" এই ভাবনা মনে উদয় হয়, সুতরাং "আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা আশা না করাই ভাল" এইরূপ বিতর্ক সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভুত হইয়া উঠে। মনে কর নানা কারণে আশা বিফলা হইল। তখন দেখিতে হইবে সুখের মুলোচ্ছেদ হইল কি না? একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জ্ঞানোপার্জ্জনে যে সুখ হয়, উপার্জ্জিত জ্ঞান বিনিময়েও সে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "বড় হইব" আশায় মনে যে আহ্লাদ ও উৎসাহ থাকে, বড় হইলে তত থাকে না। সাধারণতঃ উন্নতাবস্থায়ই তত আহ্লাদ ও উৎসাহের অভাব। সুতরাং নিরাশ হইলে আশা করিবার সম্বল সম্মুখেই রহিল, এইরূপ অনুধাবন করিলেই মনে সুখ ও উৎসাহ জন্মে।

একথা বলা যাইতে পারে ভারত কখনও আশা করিয়া নিরাশ হয় নাই। যখন ভারতে আশা ছিল উন্নতিও ছিল। রঘুবংশীয়গণ উন্নতির আশায় উত্তেজিত হইয়া বীরদর্পে বিপক্ষবিজেতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যবনের অভ্যুদয় প্রারম্ভে অগ্নিকুলোজ্জ্বল বীরগণ তাহাদিগকে খর্ব্ব রাখিয়াছিলেন। তখন ভারতের যেমন বহিঃস্রোত ছিল অন্তঃস্রোতও তেমনই ছিল। কবিগণ কল্পনা সঙ্গে উড্ডীয়মান হইয়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের অপর পার্শ্ব হইতে অতল জলধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এবং

মনোহর বিলাস ভবন হইতে অন্ধকারাবৃত গিরিগহ্বর পর্য্যন্ত এবং ততোঽধিক অপরিজ্ঞাত মানব হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। দর্শনের অন্তস্তত্ত্ব দর্শন করিয়া দার্শনিকগণ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লাভ করিতেন। সেই উন্নতির সময়ে গণিত শাস্ত্র, ভারতবর্ষ তুঙ্গ গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক হিমাচল-শৃঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপন উন্নত মস্তক পাশ্চত্য জাতি সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিল। তখন নিরাশা কোথায়? কোন্ বিভাগে আশা বিফলা?

যখন এত দিন নিরাশার কারণ হয় নাই, তখন আলস্য পরতন্ত্রতা অপবাদ হইতে মুক্তিলাভার্থ বৃথা ছলানুসন্ধান উপহাসের কারণ মাত্র।

অনেকে বলেন, আমাদের এত অভাব যে, আমরা সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে পারিব না। এটী গুরুতর ভ্রম। অভাবই উন্নতির ভিত্তিভূমি। রোমের স্বাধীনতা লোপ হইলে নরমাংস প্রিয় পিশাচবৎ সম্রাটগণ সমস্ত ইয়োরোপ ব্যতিব্যস্ত করিল; অভাবে সর্ব্বস্থান হতাশপূর্ণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ড অন্ধকারাবৃত। উপর্য্যুপরি উপপ্লবে সকলের মন দৃঢ় হইল। অভাবে মুদ্রাযন্ত্রাদির আবিষ্কার এবং উপায় চিন্তনে অন্যান্য সুবিধা উদ্ভাবিত হওয়াতে সাধারণের মন দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিল। সুতরাং উন্নত না হইবে কেন? যেমন অন্ধকার গৃহে একটী আলোক জ্বালিলে সমস্ত গৃহ আলোকময় হয়, ইয়োরোপেও তাহাই হইল। আশানল অন্তরায় নিবন্ধন দীর্ঘকাল প্রধূমিত হইতেছিল, হঠাৎ একপার্শ্ব হইতে জ্বলিয়া উঠিল। অমনি যেন দৈববলে সমস্ত ইয়োরোপ আলোকময় হইল। আমরা পৃথিবীতে যত যন্ত্র, যত কৌশল দেখিতে পাই, সে সমস্তই কি অভাববৃক্ষের ফল নয়? প্রাচীন ইহুদী জাতির ন্যায় যে জাতি যত উপদ্রুত উৎপীড়িত ও উৎক্রান্ত থাকে, তাহার উন্নতি তাত দ্রুত।

সুনীতি পরায়ণ ও সৎশিক্ষাপ্রদ ইংরেজের অধিকারে ভারতবর্ষে

আশার সঞ্চার দেখা যাইতেছে; উন্নতির বীজও উপ্ত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানী বৃদ্ধ যাহা চিন্তাও করেন নাই, আজি অজাতশ্মশ্রু বালক তাহার আলোচনা করিতেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক রাজনীতি এক্ষণে অনুশীলন করা সাধারণের কার্য্য হইয়াছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে অধীত হইতেছে। কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত উন্নতির কারণ নহে, চিহ্ন মাত্র। আমাদের প্রত্যেক ধমনীতে অভাব রহিয়াছে তথাপি উন্নতি হয় না কেন? অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের অভাব গুলিন দূরীকরণে চিন্তা বা চেষ্টা করি না বলিয়া উন্নতি হয় না। সে দোষ কেবল রাজপুরুষগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কার্য্য হয়। আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণ অপেক্ষা আমাদের আলস্য দোষই এজন্য নিন্দনীয়। আমরা বস্ত্র পরিধান করিব, আমরা তাহার জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য নই, সে চিন্তায় মাঞ্চেষ্টারের নিদ্রা হয় না। লেখনী প্রস্তুত করিব তজ্জন্য বর্ম্মিংহাম ব্যস্ত। আমাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য ফরাশি ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে; সুতরাং আমরা কেন আপন অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিব? আমরা অধ্যয়ন করিব তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সঙ্কলনে শ্বেতাঙ্গগণ দিন যামিনী পরিশ্রম করিবেন। তাঁহারা আপন আপন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন যাহা শিক্ষা দিবেন, সেই সমস্ত কথা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে, এবং আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকগণ তাহাই অপকৃষ্ট প্রণালীতে আংশিক শিক্ষা দিয়া আমাদের মনে অভিমানের বীজ রোপণ করিবেন। সুতরাং আমাদের উন্নতি কিসে হইবে?

আমরা বিনা পরিশ্রমে সকল বস্তু লাভ করিতেছি বলিয়া আমরা সুখী হই নাই। মনে যেমন আশা ও স্ফূর্ত্তির অঙ্কুর দেখা যায়, তেমনই আবার আপনাদিগকে ভুলিয়া আছি; সুতরাং কেবল আমাদের নিজের নহে, আমাদের পুত্র পৌত্রাদিকেও অলস ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া চিরদিনের

জন্য তাহাদের অসুখ উৎপাদন করিতেছি। অভাব সকল পরকীয় সাহায্যে অপনীত হওয়াতে আমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিতেছি; এবং জগদীশ্বর যাহাকে যে কিছু বুদ্ধি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কূর্ম্মের ন্যায় আপনি আপনাতে লুকায়িত আছি! সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উন্নতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়াছিল, এবং যাহার বীজ পুনর্ব্বার এই ক্ষেত্রে পতিত হইয়া আপনা আপনি সুবৃক্ষ উৎপাদন করিবে এরূপ আশা ছিল, তাহা আমরা যত্ন করিতে ভুলিয়া আছি।

ভারতভূমি কি অনুর্ব্বরা না অসার? তাহা নহে। আশাই প্রধান সার, তাহার অভাবই সকল অনিষ্টের মূল। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভাবের সহিত আশা ও চেষ্টার অভাব সংযুক্ত থাকাতে ভারতের অবনতি! কে যত্ন করিয়া ভারতক্ষেত্রে পরিপক্ব বীজ বপন করে? কেই বা প্ররোহপেক্ষী? কেই বা বারি সিঞ্চনে রত? যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে সে বালকবৎ। বালক স্বহস্তে বীজ রোপণ করে, ভূমির উপযোগিতা পরীক্ষা করে না। তাহার প্ররোহ-দর্শন-লালসা এত বলবতী হয় যে, প্রতিদিন তিন চারি বার উৎপাটন করিয় নিরীক্ষণ করে, সুতরাং বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের এক্ষণে বালকতা। উপযুক্ত আশা নাই, উদ্যোগ নাই। ভারতে বার্ক্ নাই, পিট্ নাই, সিসিরো নাই, ডিমস্থিনিস্ নাই, যাঁহার বাক্যে চেষ্টা ও আশা যুগপৎ উত্তেজিত হইতে পারে এমন কেহই নাই। যখন নেপোলিয়নের প্রাদুর্ভাবে ইয়োরোপ সহ ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত; সমস্ত রাজ্য সকল মহাদেশ জেতার পদানত; ব্রিটনীয়গণ নিরাশায় ভগ্নহৃদয়। রাজমন্ত্রী পিট্ সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সকলকে আশামন্ত্রে কবচ ধারণ করাইলেন; ব্রিটন সমস্ত বিপদ অতিক্রম এবং বিপক্ষের উন্নতি ও অশ্রু যুগপৎ অবজ্ঞা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভারতে কিছু নাই, অথচ আশার নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সকলই আছে। মনুষ্যের জীবন-বাণিজ্যে পরিশ্রম মূলধন, আশা সমুদ্র। বাহ-

বাণিজ্য উন্নতির মূল। সুতরাং উন্নতি করিতে হইলে আশা-সমুদ্রের দূরবর্ত্তী দ্বীপসমূহে শক্তি-পোত সহযোগে বাণিজ্য করিতে হইবে; নতুবা ভারতে উন্নতি নাই।

উন্নতি এক দিনের কার্য্য নয়। যদি এক সময়ের লোকের যত্নে সাধারণের মনে আশার উদ্রেক হয়, তাহার পরের শ্রেণীর লোকেরা উন্নতির মূল স্থাপন করিতে পারে। যদি স্বরোপিত বৃক্ষ অসময়ে উৎপাটিত না হয়, যদি পরিপক্কাবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে, তবে ক্রমে মুকুল হইতে পুষ্প হইবে, ফুল হইতে ফল হইবে, বিজ্ঞান আবার ভারতবৃক্ষের শাখায় শাখায় শোভা পাইবে।

প্রকৃতিতেও কিছুই অসম্ভব নাই। পর্ব্বতে শিবজী জন্মে, জলজ বৃক্ষে রণজিৎ ফল আশ্চর্য্য নহে। যে ভূমিতে কালিদাস, মাঘ, ব্যাস, বাল্মীকি ভবভূতির জন্ম; যে ভূমিতে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কপিল, গৌতমের আবির্ভাব; যে স্থানে রাম, যুধিষ্ঠির রাজ্য করিয়াছেন; মৈত্রী, গার্গী, খনা, লীলাবতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; এ সেই ভারতভূমি। হিমাচল যাহার সীমাস্থলবর্ত্তী পর্ব্বত; গঙ্গা, যমুনা নদী; বেদচতুষ্টয় ধর্ম্মপুস্তক; রামায়ণ মহাভারত, মনুসংহিতা, পুরাণাদি গ্রন্থ যাহার অঙ্গভূষণ; যে দেশে সীতা, সাবিত্রী ললনার আদর্শ; ভীষ্ম পার্থ ধনুর্দ্ধর; এ সেই ভারতবর্ষ। তবে আমরা আশা করি না কেন? আজি যদি অনন্ত সমুদ্র গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া ভারতভূমি প্লাবিত করে, আমরা আশাভেলকে বক্ষ রক্ষা করিয়া কুল প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে বিশেষরূপে অনুমোদন করিব! অশ্রুবিসর্জ্জন মাত্র উন্নতির পথ বলিয়া কাহাকেও নিরাশহৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে উপদেশ দিব না।

পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার।

মনুষ্য মনের সুখ সম্পাদনার্থ চারিদিকে কতপ্রকার পদার্থ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম মীমাংসা, গণিতের অব্যর্থ সিদ্ধান্ত, কাব্যের কুসুম-সুকুমার বর্ণনা, ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অতীত চিত্র প্রভৃতি, স্থপতি ভাস্কর বিদ্যাদির নয়নরঞ্জন, কারুকার্য্য এ সমস্তই সুখপ্রদ। কিন্তু শিক্ষিত মন জগতের নৈসর্গিক ঘটনাবলী এবং পদার্থ সকল পরিদর্শন করিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতে পারে, তাহার নিকট বিজ্ঞানশাস্ত্রও পরাস্ত;—ঈশ্বরের অনন্তসৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের নিকট সকলই তৃণবৎ। নিম্নলিখিত আবিষ্কার বিবরণটী পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কয়েকটী অনিবার্য্য দৈবঘটনা উপস্থিত হওয়াতে উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কারার্থ প্রেরিত জাহাজের অধিকাংশ লোক ও নাবিকগণ কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহারা অবশিষ্ট ছিল অধ্যক্ষের উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য অতিশয় দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে জাহাজে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং স্থলপথে প্রস্থানের চেষ্টা করিয়া একে একে তুষার মধ্যে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। জন্সন্ নামক এক জন বিশ্বস্ত নাবিক মাত্র জাহাজ ভস্মীভূত হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বস্তু যে পর্য্যন্ত পারিল তীরে উঠাইল। জাহাজের নাম ফরওয়ার্ড্ ছিল। তাহার অধ্যক্ষ জন হাতারস, ডাক্তার ক্লবনি এবং বেল্ নামক এক সূত্রধরের সহিত স্থলপথে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা পরপয়েজ নামক আমেরিকা হইতে আবিষ্কার জন্য প্রেরিত জাহাজের অধ্যক্ষ আল্তামন্দ্ নামক এক ব্যক্তিকে মৃতকল্প অবস্থায় তুষারের নীচ হইতে উঠাইয়াছিলেন। দূর হইতে ধূমরাশি দেখিয়া অপরিচিত

মুমূর্ষু কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহাদের অবলম্বন, যশোলিপ্সার ভিত্তিভূমি, দীর্ঘকালের প্রেয়নিকেতন ফরওয়ার্ড্ নামক জাহাজ খানি ভস্মীভূত হইতেছে, জন্সন্ নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ক্ষুদ্র এক খানি জাহাজ পরপয়েজের ভস্মাবশেষে প্রস্তুত পূর্ব্বক সংগৃহীত বস্তু সকল লইয়া সকলে তাহাতে আরোহণ করিলেন। চেষ্টায় আল্তামন্দ্ ও সুস্থ হইলেন। অধ্যবসায়শালী পাঁচজন তখনও অবিচলিত উৎসাহের সহিত সুমেরু সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক পৃথিবীর শেষ সীমা দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

কিছু দিন উত্তরাভিমুখে গমন করার পর এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক প্রকার কোয়াসার ন্যায় পদার্থে সমুদ্র ও আকাশ সংমিলিত দেখা গেল, ঐ পদার্থ বহুদূরবর্ত্তী ছিল। তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত ও প্রকাশিত হইতে দেখিয়া মেঘ নয় এ কথা সাব্যস্ত হইল। হাতারস্ সর্ব্বদাই দূরবীক্ষণ হস্তে বসিয়া থাকিতেন, তিনিই প্রথমতঃ ঐ দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরিশেষে নবাবিষ্কৃত দেশভাগ যখন অবধারিতরূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন "কেন্দ্রভূমি" "কেন্দ্রভূমি" বলিয়া উল্লাস শব্দে দশ দিক ব্যাপ্ত হইল। বিদ্যুৎবৎ দ্রুতবেগে এই কথা সঙ্গীয়বর্গের কর্ণগোচর হইলে সকলে বেগে অধ্যক্ষের দিকে ধাবমান হইয়া দূরবীক্ষণ সহযোগে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার ক্লবনি সেই ধূমবৎ পদার্থ মধ্যে আলোক দেখিয়া দৃষ্টপদার্থ আগ্নেয়গিরি বলিয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, দক্ষিণ কেন্দ্রে যেমন ইরিবস্ ও টেরর্ নামে দুইটী আগ্নেয় পর্ব্বত জেম্স্ রস্ আবিষ্কার করেন, উত্তর কেন্দ্রেও সেইরূপ আছে।

ক্রমে তীরভূমি সমীপস্থ হইল; আর চব্বিশ ঘণ্টা চলিয়া গেলে পৃথিবীর শেষ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে কেহ যাহা কখনও করে নাই, সেই অলৌকিক কার্য্য সাধন হইতেছে দেখিয়াও কাহারও মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সকলেই চিন্তামগ্ন এবং অচারিত-

চরণ-প্রদেশ কিরূপ স্থান তাহা কল্পনায় নিয়ত রহিল। পশুপক্ষীও এ স্থানে বাস করিতে পারে না, একে একে সকলগুলিই সন্ধ্যা আগত দেখিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে; মৎস্যগুলিও দক্ষিণদিকেই ধাবিত হইতেছে। প্রাণি-সমাগম শূন্য নির্জীব প্রদেশে উপস্থিত হওয়াতে নির্ভীক হৃদয়েও ভয়ের তরঙ্গ উত্থিত হইল। নানারূপ ভাবনায় অবসন্ন হইয়া হাতারস্ ব্যতীত অন্য সকলেই নিদ্রিত হইল।

অধ্যক্ষ পোতের কর্ণ ধরিয়া রহিলেন; জাহাজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। তাঁহার বাসনা ছিল, কোনরূপে জাহাজের গতি রোধ না হয়। কিন্তু তাহা পারিলেন না, তিনিও নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে অতীত জীবনের ঘটনাবলী মনোমধ্যে উদয় হইল। ফরওয়ার্ড নামক জাহাজের ভস্মীকরণ ও মাল্লাদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, এবং গত কয়েক মাসের কষ্ট স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার হৃদয় নিরাশার মুর্ম্মুরদাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। তখন পৃথিবীর শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় পতাকা বিস্তার করিতেছেন, হৃদয়ে এই জয়োল্লাস উদয় হইয়া তাঁহাকে অতিশয় উৎফুল্ল ও সুখী করিল। সাহসী জাহাজাধ্যক্ষের দীর্ঘ জীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা-কুসুম সকল সংগ্রহ করিয়া স্মৃতি ও কল্পনা যখন এইরূপ মাল্য রচনা করিতেছিল, সেই সুমেরু সাগরাতীত প্রদেশে বাহ্য জগৎ তখন নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিল না। আকাশ নিবিড় নীরদমালার সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অতি অল্প সময় মধ্যে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল। প্রভঞ্জনের ভীমস্বননে, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে সকলে জাগরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে রত হইল। হাতারস্ কর্ণ ধারণ করিলেন, জন্সন্ ও বেল্ ক্ষেপণীর সাহায্যে জাহাজ রক্ষায় যত্ন করিতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আবৃত থাকাতে দিঙ্নির্ণয় পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়ারও সুযোগ রহিল না।

ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টে অন্যে বিবেচনা করিত এই সৃষ্টির শেষ সীমা

ভাগ্যক্রমে ভিন্ন দেশীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাসিদনীয় আলেকৃজণ্ডার বা সেকন্দর শাহ দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবনলেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য এই যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়াও সত্যের অনুরোধে শত্রু পক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যাহা হউক নিম্নলিখিত দুইটী কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত লেখকেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যখন কোনও প্রাচীন দেশের সন্নিকর্ষে নবাভ্যুদয় বিশিষ্ট ও বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইয়ুরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, ততদূর আর কোন জাতিই হয় নাই। দিগ্‌বিজয়ী আরবদেশীয়েরা যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহি-

স্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা, মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্ক স্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও এ দেশ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধুদেশ রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় করা দিগ্‌বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্য, তুরকী ও পাঠান এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলেন। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইঁহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল;—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত হিন্দুজাতির পরিচয় হয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাঁহারা ভূয়ো-

ভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। মাসিদনীয় বিপ্লব-বর্ণন-কালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আসিয়া প্রদেশে হিন্দুর ন্যায় রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাঁহারা দেখেন নাই; এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ গ্রীক সৈন্যের হানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোনও জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি মাসিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্ত লেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করুন্।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্ন প্রসবিণী, পর রাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ-লাভ-পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত, আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখনও ছিল কি না সন্দেহ।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ইহাই যে ভারতবর্ষের চিরকলঙ্ক হইয়াছে তাহার তিনটী কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই; আপনার গুণ আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্মই এই, যে ব্যক্তি আপনাকে

মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ —রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশলী ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া পর রাজ্যলাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভে সমর্থ হয় নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীর-গৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় "ভালমানুষ" শব্দের অর্থ, ভীরু স্বভাবের লোক। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ।

হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এইক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্র-গত সাদৃশ্য অধিক নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় ইতালী ও গ্রীস এই কথার উদাহরণস্থল। মাধ্য কালিক ইতালীয় এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন

রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীন-দিগের বল-লাঘব সিদ্ধান্ত করাও তাদৃশ অন্যায়। যদি বল-হীনতা হিন্দুজাতির পরাধীনতার কারণ না হইল, তবে উহার অন্য কারণ অবশ্য আছে। আমরা এই অধীনতার কারণ যাহা বুঝিতে পারি, তাহার দুইটী মাত্র সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিত। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর, বা সুখের আকর; পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, একথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গম হয় না। স্বভাবতঃ কোন জাতি অসভ্য কাল হইতেই স্বাতন্ত্র্য প্রিয়, কোন জাতি বা সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থা শূন্য। এই সংসারে অনেকগুলি স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ, উভয়ই স্পৃহনীয়; কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধন সঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। ইহার মধ্যে কে ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয় মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাব-বিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতা প্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতা প্রিয় নহে; শান্তি সুখের অভিলাষী। ইহা কেবল জাতিগত স্বভাব-বৈচিত্রের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব

এমত আমরা বলি না ; ইহা হিন্দুজাতির চির স্বভাব বলিয়া বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া এইক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতা প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। মীবার ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না, কোন হিন্দু সমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীর দর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ প্রয়াস, এসকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের নিয়ামক নহে। যখন কোন বৈদেশিক জাতি, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, তখন হিন্দু রাজগণ আপনার রাজ্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিয়াছে ; তদ্ভিন্ন, "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ যে, কখনও উৎসাহ যুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। ভারতবর্ষে যত যুদ্ধ হইয়াছে, সে সকলই কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। যখনই সমর-লক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি প্রভাবে হিন্দুরাজা বা হিন্দুসেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, অথবা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। আর কেহ তাঁহাদিগের স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় করে নাই ; সাধারণ

সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোনও উদ্যম হয় নাই।

হিন্দু জাতির দীর্ঘ কালগত পরাধীনতার দ্বিতীয়কারণ,—হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজ মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব। লক্ষ লক্ষ হিন্দু লইয়া হিন্দু সমাজ। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার কর্ত্তব্য। আর যাহাতে কোনও হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য আর অকর্ত্তব্য, সকল হিন্দু-রই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে, এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী ও একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। হিন্দুজাতি সাধারণ্যে যে এ জ্ঞান ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে এই জাতি প্রতিষ্ঠা যে কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আমরা এমত বলিতেছি না। বৈদিককালে এবং তাহার অব্যবহিত পরে জাতি প্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবৎ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতি প্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যেরা বিস্তৃত ভারত বর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। সমাজ ভেদ, ভাষা ভেদ ও আচার ব্যবহারের ভেদ, শেষে জাতি ভেদে পরিণত হইল

সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি ও নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। সাগর মধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতা শূন্য হইল। এমন সময়ে দিগ্‌বিজয়ী মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। হিন্দুরাজগণ প্রবল পরাক্রমে বহুশত বৎসর সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করিলেন; সাধারণ জনগণ চিরাভ্যস্ত প্রকৃতি অনুসারে নিশ্চেষ্ট রহিল। আবার অনৈক্য বশতঃ হিন্দুরাজার সহিত হিন্দুরাজার বিরোধ ঘটিল। ক্রমে সমস্ত ভারতভূমি পরাধীনতার ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাবে জগৎপূজ্য আর্য্যজাতি পরাধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

মুসলমান বিজয়।

হিন্দুকুশ-পর্ব্বত-প্রস্থে তিব্বত ও তুরাণের সন্নিধানে গৌর নামে প্রদেশ আছে। সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় কষ্টসহ। তাহাদের সাহায্যে গৌরীয় সামন্তেরা ক্রমে ক্রমে গজ্‌নির প্রভুতা হইতে স্বাধীন হইয়া উঠেন এবং অবশেষে তাতার ও খোরাসানের কোন কোন অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে বেহ্রাম নামে পুরুষ গজ্‌নির সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইনি অসূয়া-পরবশ হইয়া চাতুর্য্যবলে তদানীন্তন গৌরীয় পতির প্রাণ সংহার করেন।

সেই নৃশংস ব্যাপারের প্রতিশোধ চেষ্টায় কয়েকবার গজ্‌নি ও গোরীয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে গোরীয়দিগের ভাগ্য প্রবল হইয়া উঠে। গোররাজ আলাউদ্দিন আসিয়া গজ্‌নি লুণ্ঠন এবং বহ্নি ও অসি দ্বারা উৎসন্ন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তখন তাঁহার পুত্র গজ্‌নি রাজ্যের অধীশ্বর হন; কিন্তু অনধিককাল-মধ্যেই অপঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র গয়েস্‌উদ্দিন গজ্‌নি রাজ্যের অধিপতি হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহম্মদ সবাবুদ্দিনকে আপনার সহকারী করিলেন। সবাবুদ্দিন, মহম্মদ গোরী নামেই অধিক খ্যাত। ইনি বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং তথায় এতস্থান অধিকার করেন যে, ইঁহাকেই ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রভুতার প্রকৃত স্থাপন কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মহম্মদ গোরী গজ্‌নির রাজবংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক হইয়া হিন্দু স্বাধীনতার বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার সেনারা পর্ব্বতবাসী, কষ্টসহ ও সমরচতুর; এ দিকে হিন্দু রাজারা পরস্পর অনৈক্যদূষিত, তাঁহাদের সৈন্যকুল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বিশৃঙ্খল; সুতরাং মহম্মদ স্বল্পায়াসেই জয়লাভ করিবেন আপাততঃ এরূপ বোধই হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। প্রায় কোন হিন্দু রাজাই ঘোর সংগ্রাম বিনা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশেষতঃ রাজপুতেরা কখনই পরাভূত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্পন্ন হইয়াছে; রাজপুতেরা অদ্যাপি স্বাধীন রহিয়াছে।

মহম্মদ গোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে দিল্লীর রাজার মৃত্যু হয়। আজমীর ও কনোজ উভয়স্থানের রাজারাই তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আজমীরপতিকেই দিল্লীরাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইহাতে কনোজরাজ মহাক্ষুব্ধ হইয়া বারংবার আজমীরাধিপতির সহিত সংগ্রাম করেন। সেই সকল অন্তর্ব্বিবাদ মহম্মদের জয়লাভের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

মহম্মদ প্রথমতঃ দীল্লি ও আজমীরের তদানীন্তন অধিপতি পৃথুকে আক্রমণ করেন। থানেশ্বর ও কর্ণালের অন্তর্ব্বর্ত্তী তিরৌরীর ক্ষেত্রে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মহম্মদ সমরে তুরুস্ক প্রণালী অবলম্বন করেন। সেই প্রণালীতে পাষ্ণি হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন অশ্বদল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করে, এবং ক্লান্ত হইলেই পাষ্ণি দেশে চলিয়া যায়। হিন্দুদিগের প্রণালীতে সেনারা একত্র থাকে, এবং শত্রুসৈন্যের পার্শ্বদেশ ঘূরিয়া একেবারে পরিবেষ্টন করিবার চেষ্টা পায়। এই যুদ্ধে হিন্দুপ্রণালী অধিক ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। সবাবুদ্দিন হিন্দুব্যূহের মধ্যভাগে নিয়ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রতিপক্ষেরা ঘূরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। সেই প্রক্রিয়ায় ও হিন্দুদিগের হস্তিযূথের ভীমনাদে মুসলমানেরা একান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান প্রধান আমীরেরা অনেকে সদলে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ অসীম সাহসে শত্রুসৈন্যের দুষ্প্রবেশ ভাগ আক্রমণ করিয়া রাজার ভ্রাতাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন, অবশেষে স্বয়ং আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলে অনুচরবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন

করিল। হিন্দুরা বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গজ্নিতে যাইয়া কিছুকাল আমোদ প্রমোদের পর, মহম্মদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণের আয়োজনে তৎপর হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব বারের পরাভবের অপমান নিয়ত জাগরূক ছিল। তখন যে সকল আমীর পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ নিগ্রহ দ্বারা ভবিষ্যতে তাদৃশ আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবিধানের পর মহম্মদ বহুসংখ্যক সমরকুশল সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা পৃথুও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৈন্যের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উভয় দল সম্মুখীন হইলে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পূর্ব্ব বারের পরাভব স্মরণ করাইয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, পলায়ন ভিন্ন তোমাদের উপায়ান্তর নাই; মহম্মদ সদ্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া তাহা করিলে আমরা তাঁহার উপর কোনরূপ উপদ্রব করিব না। এই অহমিকায় চতুর মুসলমান ভয়ের ভাণ করিয়া উত্তর পাঠাইলেন, আমার ভ্রাতা রাজা আমি তাঁহার অধীন সেনানী মাত্র। ভ্রাতার অনুমতি বিনা আমার আপন ইচ্ছায় প্রতিগমনের সাধ্য নাই। অতএব যাবৎ সেই অনুমতি না আইসে, অনুগ্রহ করিয়া তাবৎ কাল সন্ধি স্থাপন করিলে পরম আহ্লাদিত হই। হিন্দুরা তচ্ছ্রবণে সর্ব্বথা সতর্কতাপরিশূন্য হইয়া রজনীতে উৎসব করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনানী নিয়ত লক্ষ্য করিয়া যেমন দেখিলেন, হিন্দুরা অতিশয় বীতশৃঙ্খল হইয়াছে, অমনি অন্ধকারের সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হিন্দু-

শিবির এরূপ বিস্তৃত ছিল যে, কিয়দংশ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইতেই অবশিষ্ট ভাগ ব্যূহীভূত হইয়া সম্মুখীন হইল। তখন মুসলমান সেনানায়ক জম্বুকচাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি পর্য্যায়ক্রমে একবার ধাবিত আরবার পলায়িত হইতে লাগিলেন। অবশেষে সায়ংকালে হিন্দু দলকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপাদমস্তক বর্ম্ম-পরিহিত দ্বাদশ সহস্র অতি তেজস্বী অশ্বারোহী ধাবিত করিলেন। এপর্য্যন্তও ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই তাহাদের প্রথম উদ্যম। তাহারা এমন বেগে আক্রমণ করিল যে, আয়োধনশ্রান্ত হিন্দুরা আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সেনা শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

এই সময়ে অনেক হিন্দু সামন্ত পাতিত হইলেন। পৃথুরাজা কিছুকাল বন্দীদশায় থাকিয়া অবশেষে মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। আজমীর মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল। উহার কিয়দংশ অধিবাসীর মস্তকচ্ছেদ, অবশিষ্ট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইল। তদনন্তর মহম্মদ, কুতুবুদ্দিন নামা সেনানীর উপরে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া গজনিতে প্রস্থান করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কুতুব দিল্লী নগর অধিকার করিয়া মুসলমান-রাজত্ব বদ্ধমূল করিলেন।

বঙ্গ-বিজয়।

বেলা দুই প্রহরের সময়ে নবদ্বীপ-বাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিত জাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ

রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ, তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিবিভূষিত; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালা-বিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্য-বিবর্জ্জিত; তাহাদিগের যোদ্ধৃবেশ; সর্ব্বাঙ্গ প্রহরণজালমণ্ডিত; লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপারজাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! পর্ব্বতশিলাখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জ্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বলগারোধে অসহিষ্ণু, তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল! আরোহীরা কিবা তচ্চালন-কৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ুতুল্য তেজঃপ্রখর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে, দেখিয়া বঙ্গবাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল; কৌতূহল বশতঃ কোন নগর-বাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল "ইহারা যবন রাজার দূত।" এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল এবং সেই পরিচয়ে নির্ব্বিঘ্নে নগর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়া-ছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন মাত্র ছিল। অল্পসংখ্যক

দৌবারিকে দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?" যবনেরা উত্তর করিল "আমরা যবন রাজপ্রতিনিধির দূত, বঙ্গরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" দৌবারিক কহিল "মহারাজাধিরাজ বঙ্গেশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বকায় দীর্ঘবাহু কুরূপ যবন; দুর্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার গতি-রোধ জন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; কহিল "পশ্চাৎ অপসৃত হও, নচেৎ এক্ষণেই বর্যাঘাতে মারিব।" "আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন দৌবারিককে নিজ করস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল "এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।" অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহী মধ্যহইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন ষোড়শ যবনের কটি হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং তাহারা দৌবারিকদিগকে অশনি সম্পাত সদৃশ আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না, অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই বিনষ্ট হইল। ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরী মধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে

অসিদ্বারা ছিন্নমস্তক অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল। পৌরজন তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে যথায় বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন সেই ঘোর আর্ত্তনাদ তথায় প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে? যবন আসিয়াছে?" পলায়ন-তৎপর পৌরজনেরা কহিল "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।" কবলিত অন্ন-গ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্ক শরীর জলস্রোতঃপ্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, নিকটে রাজমহিষী ছিলেন, রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন "চিন্তা নাই, আপনি গাত্রোত্থান করুন," এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য নীত হইয়াছে; চলুন আমরা খড়কী দ্বার দিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করি।" এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খড়কী দ্বার পথে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। সেই রাজ-কুলকলঙ্ক অসমর্থ রাজার সঙ্গে বঙ্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর মাত্র লইয়া বখ্তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর কি তাহার উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটীও অস্তে গেলে পুনরুদিত হয়।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজদ্দীন বঙ্গ-বিজয়ের এইরূপ ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিক তুল্য প্রতীয়মান হইত, সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।

মুসলমান বিজয়ের ফল।

বিদেশীয়গণের বিজয় হইতে কখন কখন সুফল উৎপন্ন হয়। বিজেতৃগণ যখন বিজিতদিগের অপেক্ষা সুসভ্য হয়, তখন বিজিতদিগকে সভ্যতা দান করিয়া অনেক উপকার সাধন করিতে পারে। এই রূপে রোমীয়গণ গল ব্রিটেন প্রভৃতি অসভ্য দেশ জয় করিয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল; এবং এইরূপে ইয়ুরোপীগণ প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপের অধিবাসীদিগকে সভ্য করিতেছে। বিজেতারা যখন অধিকতর বলবান্ ও পরাক্রান্ত হয়, তখন নির্জ্জীব বিজিতদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বলবান্ করিতে পারে।

মুসলমান-বিজয় হইতে ভারতবাসীদিগের এ দুইটীর মধ্যে কোনও উপকার হয় নাই। মাহমুদ ও সাহাবুদ্দীনের স্বদেশীয় অপেক্ষা হিন্দুগণ অনেক সভ্য ছিল, সুতরাং বিজেতা-

দিগকে সভ্যতা দান করিয়াছিল, কিছু গ্রহণ কারতে পারে নাই। পরে যখন তৈমুরবংশজগণ ভারতবর্ষ জয় করিল, তখন তাহারাও ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতা লাভ করিল, ভারতবর্ষকে সভ্যতা দান করে নাই। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত মোগলবিজিত প্রদেশ অপেক্ষা আকবরশাসিত প্রদেশ ও আকবরের রাজধানী ও রাজসভা সভ্য ছিল; সে সভ্যতা মোগলগণ ভারতবর্ষে আনে নাই, সেটী ভারতবর্ষে উৎপন্ন, ভারতবর্ষে বিজিত হিন্দুদিগের নিকট শিক্ষিত।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক পরাক্রান্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কেবল তিরৌরীর যুদ্ধ ভিন্ন সমস্ত যুদ্ধে মুসলমান আক্রমণকারিগণ জয় লাভ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে কয়েক সহস্র মাত্র মুসলমান পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া অনায়াসে শাসন করিতে লাগিল; কয়েক কোটি হিন্দু এই বিজেতাদিগকে তাড়াইতে পারিল না। এইরূপ পরাক্রান্ত জাতি যদি হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে হিন্দুগণ অধিকতর বলবান্ ও রণপটু জাতি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান বিজেতৃগণ কোনও দেশের লোকের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, অন্য স্থানে যেরূপ ভারতবর্ষেও সেইরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগের বিজয় হইতে দুই জাতির একীকরণ হইল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদেশীয় বিজয় হইতে কখন কখন বিজিতদিগের উপকার হয়; কিন্তু প্রায়ই অতিশয় অনিষ্ট ও অপকার হয়। তাহার কারণ এই যে, বিজিতগণ

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ ও জাতিমর্য্যাদা হারায়; বিজেতাদিগের অধিক পরাক্রম দেখিয়া নিরাশ হয়; এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর নির্জ্জীব হয়, অধীনতা ও অবমাননা সহ্য করিতে করিতে সাহস ও স্বাবলম্বনভ্রষ্ট হয়; শেষে বিজেতাদিগকে উৎকৃষ্ট ও আপনাদিগকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া কেবল অনুকরণপটু হয়, উদ্ভাবনশক্তি ও স্বচিন্তা একেবারে বিসর্জ্জন দেয়। বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুসলমান বিজয় হইতে ভারতবর্ষের এই সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল; মুসলমান শাসনকালে ভারতবাসীদিগের জাতীয় বল যেরূপ হীন হইয়াছিল, চিন্তা-বল, কার্য্যবল যেরূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেরূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ধীশক্তিসম্পন্ন লোক যে সমস্ত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আধুনিক ইয়ুরোপীয়গণও বিস্মিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য জগৎবিখ্যাত লীলাবতী ও বীজ-গণিত রচনা করেন। তাহার পর শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান বিজয় ঘটিল; তৎক্ষণাৎ যেন মন্ত্রবলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, চিন্তাশক্তির লোপ হইল, বিজ্ঞান চর্চ্চা বিদূরিত হইল। তাহার কারণ, রাজকীয় স্বাধীনতা না থাকিলে চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না, জাতীয় সাহস ও বিক্রম ধ্বংস পাইলে চিন্তার বিক্রম ও সাহস ধ্বংস পায়।

কাব্যেও এইরূপ। প্রসিদ্ধনামা কালিদাস বোধ হয়, খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন, বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দী ও ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীতে আপন আপন চিরস্মরণীয় পুস্তক রচনা করেন। অন্যান্য কবির কথায় আবশ্যক নাই; বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। তাহার পর শতাব্দীতে মুসলমান বিজয় ঘটিল; সহসা যেন মন্ত্রবলে কল্পনাসূত্র ছিন্ন হইল, কল্পনাশক্তির লোপ হইল। মুসলমান বিজয়ের পাঁচ শত বৎসর পর পর্য্যন্ত একজনও প্রসিদ্ধ সুকবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কালিদাস ও ভবভূতির উত্তরাধিকারী নাই! তাহার কারণ জাতীয় স্বাধীনতা ও সাহসের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার স্বাধীনতার লোপ হয়।

চিন্তা ও কল্পনায় যেরূপ, কার্য্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। যে হিন্দুদিগের যুদ্ধশিক্ষা গ্রীক ও চীনগণ প্রশংসা করিয়াছে, যাহারা পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, মুসলমান বিজয়ের পর তাহাদিগের যুদ্ধক্ষমতা ও সাহস যেন সহসা লোপ পাইল, পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজপুতনা ভিন্ন অন্য কোনও দেশের অধিবাসিগণ স্বাধীনতালাভের বা ভিন্ন ধর্ম্মাদিগকে দূরীকরণের বিশেষ চেষ্টা করিল না।

খ্রীষ্টের জন্মের সময়ে হিন্দুগণ জাবাদ্বীপ আবিষ্কৃত করিয়াছিল এবং তাহার পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সিংহল, জাবা, সুমাত্রা, চীন পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিত; খ্রীষ্টের পর অষ্টম শতাব্দীতে হুয়েনসাং বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্তি

ও অন্যান্য বন্দর হইতে অর্ণবপোত সিংহল দ্বীপে গমনাগমন করিতেছে এরূপ দেখিতে পান। বিদেশীয় বিজয়ে সহসা এরূপ বলহীনতা ঘটিল যে, হিন্দুগণ ইদানীং সমুদ্রগমনের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠে, সমুদ্রগমন করিলে জাতিভ্রষ্ট হয়!

ভাস্কর কার্য্য, হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ ও শিল্পকার্য্যে হিন্দুগণের কল্পনাশক্তির অধিক পরিচয় নাই; তথাপি তাহারা যে অসাধারণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, তাহার উপর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য রাখিয়া গিয়াছে, তাহা যিনি দেখেন তিনি বিস্মিত হয়েন। কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যই হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে সাধিত হইয়াছিল, মুসলমান বিজয়ের পর কার্য্যক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এলোরা ও এলিফাণ্টার বিস্ময়কর খোদিত গহ্বর, উড়িষ্যার চমৎকার খন্দগিরি ও অসংখ্য হর্ম্ম্যাদি হিন্দুশাসন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান শাসন সময়ে মুসলমানগণ অনেক প্রাসাদ ও মস্‌জীদ প্রস্তুত করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদিগের কার্য্যক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। যে গুলি উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মুসলমান বিজয় হইতে ভারতবাসিগণ বিশেষ কোন উপকার গ্রহণ করে নাই; বরং তাহাদিগের জাতীয় জীবন দিন দিন ক্ষীণ ও বলশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং জীবনের সমস্ত বিকাশ, চিন্তা, কল্পনা, সাহস ও কার্য্যক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

"আমরা নিকৃষ্ট ও পরাধীন" এই চিন্তা মনের বল, সাহস

ও উদারতা হরণ করে, সুতরাং ভারতবর্ষে দিনে দিনে পরাধীনতার ফল ফলিতে লাগিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মানসিক বল, উদ্ভাবনশক্তি, স্বাধীন-চিন্তা, কার্য্য-ক্ষমতা ও সুন্দর কল্পনাশক্তি বিলুপ্ত হইল। ধর্ম্মান্ধতা বৃদ্ধি পাইল, দেবসংখ্যা ও পূজার আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের মর্য্যাদা হ্রাস হইল, ধর্ম্মান্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণগণই কেবল বেদপাঠের ও উপবীতধারণের অধিকারী, অন্য সকল জাতি শূদ্র বা শূদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের দাস. এই মত প্রচারিত হইল। আপনাদিগের আধিপত্য অধিকতর স্থিরীকরণার্থ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্র স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, নূতন নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে লাগিলেন, এবং সেই গুলি বেদব্যাস-রচিত এইরূপ প্রচারিত হইল। এইরূপে বলহীন পরাধীন জাতি দিনে দিনে চেষ্টাহীন হইয়া সহস্র মন্দিরে কেবল পূজা ও ক্রন্দনে শান্তি লাভ করিতে লাগিল।

মীরাবাই।

মীরাবাই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া যেরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী সারস্বতী শক্তির ন্যায় যেরূপ তদগতচিত্তে স্বীয় বরণীয় দেবতার গুণ গান করিয়াছেন, অবলাপ্রকৃতিতে সেরূপ তপস্বি-ধর্ম্ম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্ন-

লিখিত বিবরণ পাঠে সেই ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণতা অনুমিত হইবে।

মীরাবাই মেরতা নামক রাজপুতনার একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের জনৈক রাঠোরবংশীয় রাজার কন্যা। মিবারের রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মীরা অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। সাহস, পরাক্রম, ও শাসন-দক্ষতায় কুম্ভ মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। যে গৌরবসূর্য্য দৃষদ্বতী নদীর তীরে অনন্ত-প্রসারিত শোণিত-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, দুরন্ত পাঠান-রাহুর পরাক্রমে যাহার প্রচণ্ড কিরণ অন্ধকারে পরিণতি পাইয়াছিল, রাণা কুম্ভের ক্ষমতাবলে তাহা ধীরে ধীরে সমস্ত মিবার আলোকিত করিয়া তুলে। কুম্ভ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি অসামান্য পরাক্রমে ও অসামান্য সদাশয়তায় তৎকালীয় অনেক রাজাকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন।

কুম্ভ, মিবারে অনেক গুলি জয়স্তম্ভ ও অনেক গুলি গিরি-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মিবার রক্ষার্থ যে চৌরাশীটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে চৌত্রিশটী রাণা কুম্ভের সংগঠিত। কুম্ভমির (প্রচলিত নাম কমলমিয়র) রাণা কুম্ভের অসাধারণ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই দুর্গ শত্রুগণের অভেদ্য বলিয়া চিরকাল রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। রাণা কুম্ভের গুণ গৌরব কেবল এই সমস্ত কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই, সুকবি ও সুবিদ্বান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসা-

রিত হয়। কুম্ভ বঙ্গীয় কবিকুল শিরোমণি জয়দেবের প্রণীত গীতগোবিন্দের এক খানি টীকা প্রস্তুত করেন। যাহা হউক মীরাবাই পতির এই সৌভাগ্য-শ্রীর কতদূর অংশভাগিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে

ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। যদি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তির কার্য্য স্থগিত হয়, তাহা হইলে হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় অতিশয় শোভাহীন হইয়া পড়ে। ভক্তি নিয়ত ঊর্দ্ধগামিনী। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকে, তিনি মানব হইয়াও দেবলোকের পবিত্রতম সুখ সম্ভোগ করেন, এবং মর্ত্ত্য হইয়াও অমর ভোগ্য পবিত্র সুধার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। ভক্তি কখনও কোন প্রকার পার্থিব পঙ্কে কলুষিত হয় না। ইহা পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়-তই স্বচ্ছ, আবিলতাবর্জ্জিত ও জীবনতোষিণী। যথার্থ ভক্তি-মান্ ব্যক্তি কখনও নীচতা বা হীনতার কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকেন না। তিনি ভ্রমর-চুম্বিত প্রভাত-কমলের মনোহর মাধুরী দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্ত ও সুখী হন, অনন্ত জড় জগতে অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়াও তেমনই সুখী ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগরের ভীষণ মূর্ত্তি, চঞ্চল তড়িল্লতার অপূর্ব্ব বিকাশ, সমুন্নত ভূধর-মালার গম্ভীর দৃশ্য, দিগ্‌দাহকারী দাবানল, প্রলয়ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় সেই অনন্ত শক্তির অনন্ত স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। তিনি সংসারী হইয়াও যোগী, মানব হইয়াও দেবলোক-বাসী এবং সংসার-সমুদ্রের নগণ্য জল-বুদ্‌বুদ্ হইয়াও মহীয়সী শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এ নশ্বর জগতে—এ জীবলোকের

ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা সম্ভবে না।

ভক্তি অনেক বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে দেবতার দিকে যে ভক্তি প্রধাবিত হয়, মীরাবাই তাহারই জন্য সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইতেছেন। দেবভক্তি অপূর্ণকে পরিপূর্ণ ও অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের রেখা-পাতে সুশোভিত করে। মনুষ্য এই জড় জগতে ক্ষুদ্রতম জীব; উর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে কিয়ৎক্ষণ বক্ষঃ স্ফীত করিয়া জলগর্ভে বিলয় পায়, বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্তমাত্র প্রভা বিকাশ করিয়া নবজলধর-সমূহে অন্তর্হিত হয়, নশ্বর মানবও তেমনই এই নশ্বর জগতে কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইতেছে। অপূর্ণ ও অস্থায়ী জীব ইহা বিবেচনা করিয়া ভক্তির সাহায্যে সহজেই সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরাৎপরে সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সংসারের অস্থায়িত্ব ও নিজের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মনুষ্য আপনা হইতেই অনন্তশক্তি দেবতার শরণ লয়, এবং এই দেব-ভক্তির বলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম মন্দিরে আরোহণ করিয়া পবিত্র আনন্দের রসাস্বাদ করিতে থাকে। কেহ শিখায় না, কেহ বলিয়া দেয় না, তথাপি এই ভক্তি উর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া মনুষ্যকে বরণীয় দেবতার স্বরূপ চিন্তায় নিয়োজিত করে। তরঙ্গিণী যেমন সাগরের দিকে অবিরামগতিতে প্রবাহিত হয়, ভক্তির প্রবল বেগে সাধনা ও তপস্যাও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কেহই এই অসীম ভক্তির গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি শক্তিতে অসীম,

দয়ায় অসীম, অসীম ভক্তিস্রোতঃ যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য তাড়িত বেগকেও উপহাস করিয়া ধাবমান হয়, তখন সঙ্কীর্ণ-শক্তি সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সামান্য মানব কিছুতেই সে স্রোতঃ আপনার ক্ষমতায়ত্ত করিতে পারে না।

মীরাবাই এই দেব-ভক্তির বলে অটল হইয়া সমুদয় পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার-গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির-অধিপতি পতি দিয়াছিলেন, তথাপি মীরার ভোগ-সুখ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরা অতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামী-গৃহে যাইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিলেন, এবং আত্মসংযত ও ভক্তি-পরায়ণ হইয়া রণছোড় নামক আরাধ্য কৃষ্ণমূর্ত্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গ প্রগাঢ় শক্তি-উপাসক ছিলেন। এজন্য স্বামী-গৃহে গমনের অব্যবহিত পরেই মীরার সহিত তাঁহার শ্বশ্রূর ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরার শ্বশ্রূ মীরাকে বিষ্ণু উপাসনায় বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইল না। মীরা যে ভক্তির স্রোতে দেহ ভাসাইয়া-ছিলেন, রাজমাতা সে স্রোত নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এজন্য রাজমাতা মীরাকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করি-লেন। মীরা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তি হইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি-লেন প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে তাহা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, রাণাকুম্ভ মীরার আবাসের নিমিত্ত

স্বতন্ত্র স্থানে ও ভরণপোষণের জন্য কিছু অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, মীরা স্বামিগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রণছোড়ের আরাধনায় রত হইলেন। অনেক নিরাশ্রয় বৈরাগী তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মীরা এই-রূপে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-ভূমি হইয়া দয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণা তপস্বি-নীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মীরাবাই মথুরা ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। কথিত আছে, মীরা যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, তৎকালে রাণা আপনার অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যা-চার আরম্ভ করেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ এই সময়ে মীরাকে আনয়ন করিবার জন্য দ্বারকায় প্রেরিত হন। মীরা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার আরাধ্য দেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং মীরা তাহাতে প্রবেশ করিবা মাত্র উহা পূর্ব্ববৎ হইয়া গেল। এই অবধি মীরাবাই চিরকালের মত নরলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি মিবারে রণছোড় নামক কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত মীরাবাইর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণে নির্দ্দেশ করে যে এই পূজা রণছোড়ের অভ্যন্তরে মীরাবাইর অন্তর্দ্ধানের স্মরণ-সূচক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মীরাবাইর কোন ধারাবাহিক জীবন চরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ঘটনাই এক্ষণে উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীরা পরম সুন্দরী ছিলেন। সৌন্দর্য্য-গরিমায় তৎকালে প্রায় কেহই তাঁহার তুলনীয় ছিল

না। কিন্তু তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। তাঁহার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-প্রেম ও স্বার্থত্যাগের অসাধারণ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মীরা দেবভক্তির নিমিত্ত অতুল রাজত্ব-সুখ ও অতুল ভোগ-বিলাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। প্রগাঢ় সাধনা ও প্রগাঢ় তপস্যায় তাঁহার হৃদয় চির-প্রফুল্ল থাকিত। মীরাবাইর অন্তর্দ্ধান-ঘটনা যদিও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক ও অবিশ্বাসযোগ্য, তথাপি উহা তাঁহার উৎকট সাধনার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ মীরাবাই যে আপনার সাধনায় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাধনা ও তপস্যার জন্যই তিনি অনেকের নিকট দেবীভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

মীরাবাইর নামে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মীরাবাই ও তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হলদীঘাটার যুদ্ধ।

(আকবরের পূর্ব্বে কোনও সম্রাট রাজস্থান বশীকৃত করিতে পারেন নাই। আকবর সদাচরণ ও বুদ্ধিবলে তাহা কতকদূর সম্পাদন করিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুত রাজগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু মেওয়ার প্রদেশের মহারাণা (রাণা) তাহা স্বীকার করিলেন না। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মেওয়ারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলেন। সংগ্রামসিংহের অযোগ্য পুত্র উদয়সিংহ তখন রাণা ছিলেন। তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন, চিতোর আকবরের হস্তগত হইল। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় বীর প্রতাপসিংহ পর্ব্বত ও কন্দরে বাস করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সপরিবারে তাড়িত হইয়াও আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন না; বরং বৎসর বৎসর আকবরের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথম বৎসরে (১৫৭৬) হলদীঘাটায় অম্বরের রাজপুত রাজা মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সেলীম প্রতাপকে পরাস্ত করেন, এবং কমলমীর ও গোগুন্দ দুর্গ অধিকার করেন। এইরূপে বৎসর বৎসর পরাস্ত ও দুর্গচ্যুত হইয়াও প্রতাপ অধীনতা স্বীকার করিলেন না; অবশেষে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অসাধারণ বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক মোগলদিগকে দেওয়ীরের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পুনরায় মেওয়ার কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপের অসামান্য অধ্যবসায় ও বীরত্ব দেখিয়া আকবরও তাঁহার সাধুবাদ করিলেন, এবং মেওয়ার বিজয়ের আর উদ্যোগ করিলেন না।)

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা; অপর দিকে শিশোদীয় কুলের চির স্বাধী-

নতা-রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা! একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধারা আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রু সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে। পর্ব্বত শিখরের উপর অসভ্য জাতিরা ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া বর্ষার বৃষ্টি-বিন্দুর ন্যায় অজস্র তীর নিক্ষেপ করিতেছে, এবং সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন; সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। চোহান, রাঠোর ও ঝালা প্রভৃতি সকল কুলের যোদ্ধারা ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। এই ঘোর উৎসবে যেন বিপদই বাঞ্ছনীয়, যেন মৃত্যুই জয়লাভ! কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে; দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিলেন।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই অম্বরাধিপতির দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া রোষে বলিলেন, কাপুরুষ, দিল্লীর দাস! দিল্লীর সৈন্য-বলে অদ্য জীবন রক্ষা করিলে। রাজপুতকুলাঙ্গার! রাজপুতগণ নিজ খড়্গের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম অদ্য ভুলিলে। মানসিংহ বহুদূরে তীব্রনয়নে সৈন্যরচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এ তিরস্কার কথা শুনিতে পাইলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ সেলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করাইলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগল সৈন্য সজ্জিত ছিল; বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসির আঘাতে সৈন্য-রেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন, কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে? সেলীম ও প্রতাপসিংহ পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। দুইপক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে ভীষণ জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না; শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সেলীমের রক্ষকগণ ভূতল-

শায়ী হইল, তখন প্রতাপ সেলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সেলীম সে দিন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য; লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল; হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সেলীমকে লইয়া পলায়ন করিল; দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত রাজপুত তুমুল শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সেই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল; মুসলমানেরা মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধৃগণ ভীরু নহে; পঞ্চ শত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবারে "আল্লা হো আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে অন্যায় সমরে হত হইতে লাগিল। প্রতাপসিংহ প্রায় একাকী শত শত্রুর মধ্যে অপূর্ব্ব যুদ্ধ করিতেছেন। শরীরের সপ্ত স্থানে * আহত হইয়াছেন, কিন্তু তখনও বিপদ জানেন না, তখনও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন!

* এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বর্শার আঘাত, অপর তিন স্থানে খড়্গের আঘাত।

পশ্চাৎ হইতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ দেখিতে পাইলেন, তখন হুঙ্কার শব্দ করিয়া বীরগণ শিশোদীয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন, পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া প্রতাপ যে স্থানে প্রায় একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, প্রভুর অনিচ্ছায় প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সবলে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল। রাজপুতের হৃদয়ের শোণিত রাণার ;—রাণার জন্য সে শোণিত রহিল।

একবার নহে, সেই দিন ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রতাপসিংহ যুদ্ধ মদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তিনবার তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনে। যে বাহু একাকী ভারতবর্ষের বলবীর্য্যের সহিত যুঝিতে সাহস করিয়াছিল, অদ্য ভারতবর্ষের একীকৃত সৈন্যগণ সে বাহুর বিক্রমের পরিচয় পাইল।

তখনও প্রতাপের উন্মত্ততার শান্তি হয় নাই। চারিদিকে রাজপুত হত ও আহত হইয়াছে দেখিয়া রোষে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সে তেজ কে প্রতিহত করিতে পারে? পুনরায় শত্রুসেনা ভেদ করিয়া শত্রুকটকে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল ; রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল ; প্রতাপের বহির্গমনের আর পথ নাই! এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত

করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে; মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ দিবে। *

এবার রাজপুতদিগের মহা বিপদ উপস্থিত। প্রতাপের সঙ্গী বীরগণ একে একে হত হইতে লাগিলেন; শত্রুকে হত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত্রুসংখ্যা অগণ্য; একজন হত হয়, দশজন তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। প্রতাপসিংহ আপন বিপদ জানেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমে অল্প হইতেছে, শত্রুরাশি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতাপসিংহ উন্মত্ত! তখনও অগ্রসর হইতেছেন। পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা

* চিতোর ধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পৈতৃক প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকিতেন। মানসিংহ শোলাপুর হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় প্রতাপ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য প্রতাপসিংহ উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। উদয় সাগর তীরে মহা সমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। মানসিংহ ভোজনে বসিলেন, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মানসিংহ উত্তর করিলেন, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই। সে জন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে কাংস না দেন কে দিবেন? প্রতাপসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন, যে রাজপুত তুর্কীকে ভগ্নী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না। মানসিংহ এই উত্তর শুনিয়া মহাক্রোধে অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলেন, এবং এই অবমাননার প্রতিশোধ জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

করিলেন, কিন্তু মোগল সৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীন-বল হইয়াছে, প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব! তথাপি বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার বীর মল্ল এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন; পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন স্বর্বর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, মহাকোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন। সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীরপ্রবর মল্ল শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণ-কুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। মল্ল সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, সেই উদ্যমে সম্মুখ রণে আপনার প্রাণদান করিলেন। পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।" দৈল-ওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামি-ধর্ম্ম জানে; বিপদকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।" জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সে দিন ভূতলশায়ী হইল; অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র

ত্যাগ করিল; প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধারা যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া সন্ধ্যা বা সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিত।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদের শান্তি হয় নাই; দুই জন মোগল তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল; মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত; পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতশ্রেণীতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী, সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

প্রতাপসিংহ সরোষে কহিলেন, সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই, এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত বা রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকটে আসিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ, এক দিন আপনার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, অদ্য সে

ভাব তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করুন, কুলকলঙ্ককে পবিত্র কুলে আশ্রয় দিন, আর সে কুলের অবমাননা করিবে না। রাজন্ আপনি জ্যেষ্ঠ, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে মার্জ্জনা করিবে? প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহু দিনের বৈরভাব দূরে গেল, উভয়ের হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব, প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে; ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, স্নেহ যাচ্ঞা করিতেছে। প্রতাপ কি সেই স্নেহ দানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রু নয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন; ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন; অব্যর্থ বর্শায় সেই মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন; পরে ভ্রাতার নিকট ভ্রাতৃস্নেহ যাচ্ঞা করিতেছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর

প্রতাপসিংহ কহিলেন, ভাই শক্ত, আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে ; আজি বিজয়ের দিন ; আজি যে অপহৃত ধন করিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ নহে ? ভাই ! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে, তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বদেশ রক্ষা করিব। মানসিংহকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বরকেও ভয় করিব না।

প্রতাপ সিংহের পরাক্রম।

শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হলদীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবন দান করিলেন। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিলেন না, অগত্যা মেওয়ার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ; প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘ মাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখা দিল। বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা চেষ্টা ; মনুষ্যের যাহা সাধ্য করিলেন, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল সেনানী শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে ভীষণ উপত্যকা ছিল, এই পর্ব্বতদুর্গ সেই উপত্যকার উপরি নির্ম্মিত।

দুই পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশি মেঘমালার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিত, মধ্য দিয়া নির্ঝর, পর্ব্বত-তরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে সেই দিক হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যত দিন সাধ্য তত দিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীয় জল দূষিত হইল, সেনাগণের পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুল হস্তে অর্পণ করিয়া শত্রুগণ না আসিতে আসিতে অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন। প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমর-কুলাধিপতি যুদ্ধ-প্রারম্ভে এই দুর্গে মহারাণার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "স্বদেশ রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবন দান করিবে" সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন, কমলমীর রক্ষার্থ জীবন দান করিলেন। যোদ্ধার ইহা অপেক্ষা অধিক সাধ্য নহে; কমলমীর শত্রুহস্তে নিপতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ পশ্চিমে চপ্পন প্রদেশে চাওয়ন্দ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ঐ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য, এস্থানে কেবল পার্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী; প্রতাপ চাওয়ন্দ দুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শত্রুগণ নিরস্ত রহিলেন না, কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গোগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহাবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদ

খাঁ চপ্পন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতাপের চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারি দিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারান নাই; যত দিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, তত দিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বত কন্দরে, উপত্যকায়, ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের নাম রাখিবেন।

ভারতবর্ষের সমগ্র বলবীর্য্য আষাঢ় মাসের বৃষ্টির ন্যায় মেওয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; প্রতাপ সেই ভীষণ বাত্যার মধ্যে স্থির ও অকম্পিত। পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুত সেনা লুক্কায়িত থাকিত, উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত; নিশীথে পর্ব্বতচূড়ায় দীপালোক দেখিলে, প্রতাপের সেনানীগণ তাহার অর্থ বুঝিত; নির্জ্জন বনে শব্দ শুনিলে তাহার অর্থ বুঝিত; এইরূপ ইঙ্গিতে, মধ্যে মধ্যে সময় পাইলেই প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন, এবং শত্রুদিগকে অজ্ঞাতসারে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইতেছেন বা লুকাইয়া আছেন ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন। চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে; পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে; মানসিংহ, সাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহাবৎ খাঁ চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছেন; কিন্তু

মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত; প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

ফরিদ খাঁ সসৈন্যে চপ্পন অধিকার করিয়া চাওয়ন্দ দুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নতপর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহোল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন, সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারি দিকে নীত হইল; ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনানী-গণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল, সহসা ফরিদ খাঁ চারিদিকে অগণ্য রাজপুতসৈন্য দেখিলেন; সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা তাঁহার এক জন সৈন্যও আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ-গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগ-তের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন,—সেই পর্ব্ব-তের প্রত্যেক উপত্যকায় বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন।

ভবিষ্যৎ-গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল, সেই অন্ধকার মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুদালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর হইয়া চমকিত হইতে লাগিল। দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোক-চ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা চম-কিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল ; মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া পুনরায় সে বৎসর মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল ; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

পুনরায় শত্রুগণ পর্ব্বত ও উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল ; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন ; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে৲।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল, শত্রুসৈন্য আরও রাশীকৃত হইতে লাগিল ; ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ার নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন।

সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল ; অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী ও সুশিক্ষিত সৈন্য তরঙ্গের ন্যায় মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল ; নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না ; মেওয়ার-বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন

গহ্বরে বাস করিতেন; মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন; শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন; কথন বন্য ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কথন বন্য পশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজ-পরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় পাইতেন না। কথন কথন ক্ষেত্রের "মল" দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না; মেওয়ার-বিজয় হইল না।

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল; মেওয়ারের আকাশ মেঘঘটায় আরও আবৃত হইতে লাগিল, শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, দুর্গ সমুদয় একে একে শত্রুহস্তগত হইল, কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

একদা সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল প্রভৃতি সকল কুল ও শাখাকুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন; বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণ শিক্ষা পাইয়াছেন; শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব, আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব! ভবিষ্যতে কি কর্ত্তব্য, প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছেন, এই রাজপুত-মণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই।

যতদিন সাধ্য ছিল যুদ্ধ হইয়াছে; শত্রু-বিরুদ্ধে মেওয়ার

দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য। শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রধান প্রধান প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন? পুরাতন সেনা প্রায় সমস্ত হত হইয়াছে, মেওয়ারের আর সৈন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিতে দেন এমন স্থান নাই। চারিদিকে অসংখ্য মোগল সৈন্য রাশীকৃত হইতেছে, চারিদিক হইতে তাহারা অগ্রসর হইতেছে, প্রতাপসিংহ কি লইয়া তাহাদিগের গতির প্রতিরোধ করিবেন? দুর্গে থাকিয়া অচিরে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? না, অম্বর ও মাড়ওয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দেন? যে স্বাধীনতার জন্য এত দিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে নিশীথে অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানে সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছপদ স্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি তুর্কীর দাস হইবে? বীরগণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তদপেক্ষা বংশ নির্ম্মূল হওয়া ভাল"

আর এক উপায় আছে। রাজস্থানের পুরাতন রীতি অনুসারে সমস্ত যোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করুন, রাজপুত রমণীগণ চিতারোহণ করুন। সে যোদ্ধৃমণ্ডলীর মধ্যে এক জনও সে প্রস্তাবে ভীত ছিলেন না, কিন্তু পুরাতন শিশোদীর বংশ কি জগতে একবারে বিলুপ্ত হইবে? পূর্ব্বপুরুষগণ কি স্বর্গ হইতে এই দৃশ্য দেখিবেন যে, যে বংশের উন্নতির জন্য তাঁহারা এত যত্ন করিয়াছিলেন, জগতে সে বংশের নাম নাই!

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া অসম্ভব নহে। আকবর মহাবল পরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান; কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন, তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয় বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল; কিন্তু প্রতাপসিংহ জ্বলন্তনয়নে চাহিয়া কহিলেন, "একবার দাসত্ব স্বীকার করিলে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বটে, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশের এ কলঙ্ক কখন দূর হইবে না; প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে এ কলঙ্ক হইতে পারিবে না। বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে। মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্য দেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীর বংশ কলুষিত হইবে না।" প্রতাপের জ্বলন্ত নয়ন অশ্রুপূর্ণ! যোদ্ধৃগণ ভীষণনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল "বাপ্পারাওয়ের কুল কলুষিত হইবে না।"

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিল। যাহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহানুভব আক্‌বর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন, দিল্লীর মণিমাণিক্য-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষ জয় জয় শব্দ হইল।

পাঠক, এ উপন্যাস কথা নহে; প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর বীরত্বকথার নিকট উপন্যাস কথা কি ছার। কোন্ উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইহা অপেক্ষা প্রকৃত দেশানুরাগ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছ? ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের কথা স্মরণ হইলে উপন্যাস কথা কি অসার বোধ হয়? আর্জ্জুনির কথা কি অলীক বোধ হয়? প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা কর; তিনি সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আক্‌বর সাহের সহিত একাকী যুঝিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর অবিশ্রান্ত কন্দর বাসী ক্ষত্রিয় একাকী দেশ রক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন! পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর; কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্ন লিখিত কবিতাটী

পাঠ কর; উটী আমাদিগের অসার লেখনী নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আক্‌বরসাহের রাজ সভার প্রধান সভাসদ খান্‌খানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুকে উপলক্ষ করিয়া উটী লিখিয়াছেন।

"জগতে সমস্তই ক্ষণ স্থায়ী, ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে, কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না। প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই; ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতির মান রাখিয়াছেন।"

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিয়াছেন; মেওয়ারে শিশোদীর কুলের স্থান নাই; শিশোদীর কুল সিন্ধুনদীর তীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান বীরকুল সসৈন্য ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন; আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে পশ্চিমদিকে মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ার দেশ। সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধারা সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই চিন্তাকুল! সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদিত হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে

বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীর বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজত্ব করিয়াছেন, যে দেশে সকলে বাল্যকালে ক্রীড়া করিয়াছেন, যৌবনে যুদ্ধ করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন বহির্ভূত হইবে! যোদ্ধাগণের হৃদয়ে এই সমস্ত চিন্তার উদ্রেক হইতেছে, সকলে নীরবে সেই পর্ব্বতমালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মেওয়ারের প্রতি পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা একে একে মনে উদিত হইতেছে; যে যে উপত্যকায় পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে অনন্ত শোণিত পাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদিত হইতেছে; মেওয়ারের অনন্ত বীরত্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। যোদ্ধৃমণ্ডলী নীরব ও শোকাকুল, নীরবে অনন্ত যশঃপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

"যথার্থই শিশোদীর বংশ নির্ব্বাসিত হইবে? ঐ সুন্দর মেওয়ারে কি শিশোদীর বংশের আর স্থান নাই?" প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বীর-হৃদয় রোষে বিষাদে স্ফীত হইল। সে বীরের সেই প্রশ্ন শুনিয়া যোদ্ধৃগণের হৃদয়ও রোষে স্ফীত হইল, তাঁহারা বলিলেন, রাজন্! আপনার আজ্ঞায় এখনও স্বদেশের জন্য জীবন দিতে দাসগণ প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ আর হয় না; কেননা, অর্থ নাই, সম্বল নাই, সঙ্গতি নাই, যুদ্ধের কোন উপায় নাই।" পুনরায় সকলে নির্ব্বাক্।

সভায় সকলে নিস্তব্ধ! তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল

"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।" বিস্মিত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারের মন্ত্রিত্ব কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ প্রতাপসিংহের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছিলেন, প্রতাপের স্ফীত হৃদয় দেখিয়াছিলেন, এবং প্রতাপের হৃদয়ের অব্যক্ত ও অব্যক্তব্য ভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে ভাব বুঝিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর করিলেন; 'এখনও মেও-য়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।' সায়ংকালের বায়ুতে বৃদ্ধের শুক্ল কেশ উড়িতেছে; সায়ং-কালের অন্ধকারেও বৃদ্ধের উদ্দীপ্ত নয়নের দীপ্তি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; বৃদ্ধ নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! সভাস্থ সকলে চমকিত, সকলে নিস্তব্ধ!

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্ত্রিবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে? প্রতাপসিংহ দেখিতেছেন না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।'

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'দাস বহুদিন মন্ত্রিত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ বহু পুরুষপর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ হইতে পারে; অনুমতি করিলে, দাস সে ধন প্রভু-পদে সমর্পণ করে।

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামিধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণহইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাণা, প্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইবেন? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র হইলেও তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম।"

সভাস্থ সকলে পুনরায় নির্ব্বাক্। ভামাশাহ পুনরায় গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ারের রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে; মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার আর কি উপকার করিতে পারে? মহারাণা, শিশোদীয়ের ধন, মান, প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য ব্যয় হইবে, তাহাতে আক্ষেপ কি?"

প্রতাপসিংহ অনেকক্ষণ নতশিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর জ্বলন্ত নয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর এক বার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, দেখিব। আপনার এ কার্য্যের পুরস্কার দেওয়া আমার দুঃসাধ্য, জগদীশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিন।"

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন। সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে; দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া

অবস্থিতি করিতেছিলেন; প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন, সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ সসৈন্যে হত হইলেন।

সে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল; আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল। ঝটিকা বহিতে লাগিল; কমলমীর হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল। ঝটিকা বহিতে লাগিল। মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইল; চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল; ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবর সাহকে জানাইল যে, ক্রমাগত দশবৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবল পরাক্রান্ত আক্বরসাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন, দেশ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্য স্থান লুণ্ঠন করিলেন।

প্রতাপ যত দিন জীবিত রহিলেন, আকবর যত দিন জীবিত ছিলেন, আর মোগলকর্ত্তৃক মেওয়ার আক্রান্ত হয় নাই।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটী মহাপরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। হিন্দুদিগের রাজত্বকালে সোহাগপুর, ছত্রিশ গড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত হয়। গড়মণ্ডল রাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। ইহার কোথাও লোকাকীর্ণ পল্লী, সুরম্য জলাশয় ও কমনীয় উপবন, নেত্র-তৃপ্তিকর গ্রামীনতার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, কোথাও প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিনী বৃক্ষ-সমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে রজত-মালার ন্যায় পরিশোভিত হইতেছে, কোথাও নবীন লতা-সমুহ সুদৃশ্য পুষ্প ও পল্লবে সজ্জিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহীমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথাও ভীমদর্শন পর্ব্বত স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও প্রস্রবণ-সমুহ পরিস্কৃত সলিল প্রদান করিয়া অরণ্যেচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণতীরে জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা শৈলমালায় পরিবেষ্টিত থাকাতে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যবন রাজগণ দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করিয়া চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিলেন; ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য তাঁহাদের অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, কিন্তু কখনও গড়মণ্ডলে তাঁহাদের প্রতাপ প্রবিষ্ট হয় নাই। যবন

ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিয়া গড়রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে অসমর্থ হই-য়াছিল।

মোগলবংশীয় আকবরসাহ যখন দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, তখন চন্দন নামে মহব্বা-রাজের কন্যা পতিবিহীনা দুর্গাবতী গড়রাজ্যের অধিপত্নী ছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে দুর্গাবতীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী মহিলা ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দুর্গাবতীর কেবল সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল না; তাঁহার প্রকৃতিও অসাধারণ ছিল। দুর্গাবতী অবলাহৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও তেজস্বিনী ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতে পরবশে থাকিয়াও রাজ্য-শাসনের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করি-য়াছিলেন। তাঁহার সাধনা সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকিত, তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল সম্পাদনে যত্ন প্রদর্শন করিত। লোকে রণভূমিতে তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ ভীত হইত, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতেও কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতি অনুভব করিত। দুর্গাবতী তেজস্বিতা ও কোমলতা উভয়েরই অবলম্বন ছিলেন, উভয়ই তাঁহার হৃদয়কে সমুন্নত ও সমলঙ্কৃত করিয়াছিল।

আকবরসাহ রয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বহরাম নামে তাঁহার প্রধান কার্য্য-সচিবের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক অবাধ্য আমীর ও ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য নানা স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সেনাপতিদিগের মধ্যে আসফ খাঁ নামে একজন উদ্ধত-স্বভাব সৈনিক-প্রধান নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশের শাসনার্থ প্রেরিত হন। আসফ খাঁ

গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং এইরাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। আকবরসাহ স্বাধিকার সম্প্রসারিত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, তিনি সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকারভুক্ত করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আদেশ ও উৎসাহে সাহসী হইয়া ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আসফ ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বাদশ সহস্র পদাতি সমভিব্যাহারে গড়মণ্ডল আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই অভিযান-বার্ত্তা গড়রাজ্যে ঘোষিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই এই আকস্মিক আক্রমণ সংবাদে যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার বা কর্ত্তব্য-বিমূখতার আভাস লক্ষিত হইল না। তিনি অকুতোভয়ে, প্রগাঢ় সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ সমর সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, সৈন্যগণ যুদ্ধাভরণে সমলঙ্কৃত ও রণমদে উন্মত্ত হইয়া সমবেত হইতে লাগিল, রণপণ্ডিত সেনাপতিগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই গড়রাজ্যে বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল। দুর্গাবতীর বীরবল্লভ নামে অষ্টা-দশবর্ষবয়স্ক একটী পুত্র সন্তান ছিল, এই যুবকও অমিত বিক্রমে আসিয়া যুদ্ধ-যাত্রীর দলে সম্মিলিত হইলেন। দুর্গাবতী এই সৈন্য সমষ্টির শৃঙ্খলা বিধান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শিরোদেশে রাজ-মুকুট, এক হস্তে শূল ও অপর হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক

গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এক্ষণে স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্ববংশের সম্মান রক্ষার্থ অটলতা ও অনমনীয়তার আস্পদ হইল। দুর্গাবতী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরোন্নত স্বরে স্বীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—"তোমাদের প্রতি অদ্য একটী মহৎ কর্ত্তব্যের ভার সমর্পিত হইতেছে; আমি আশা করি তোমরা কখনও এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে না। জীবন চিরস্থায়ি নহে, পার্থিব সুখ চিরস্থায়ি নহে, এবং ভোগ-লালসাও চিরস্থায়িনী নহে। অদ্য যে জীবন-স্রোতঃ খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে, হয়ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন হইতে পারে, অদ্য যে পার্থিব সুখ দেহের প্রতিগ্রন্থি অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে, হয়ত কল্যই তাহা দুঃখের ভয়াবহ আক্রমণে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং অদ্য যে ভোগ-লালসা উদ্দাম মানবী প্রকৃতিকে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিতেছে, হয়ত কল্যই তাহা নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া হৃদয়ের প্রতিস্তরে নিদারুণ তুষানলের সঞ্চার করিবে। ঈদৃশ ক্ষণ-ভঙ্গুর, ক্ষণস্থিতিশীল বিষয়ের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া অনন্ত সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর, প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া বিদেশী শত্রুকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিতে সমুদ্যত হও। তোমাদের করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমাদের অধিষ্ঠিত তেজস্বী তুরঙ্গম শত্রুর শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমাদের পরাক্রম ও তোমাদের রণপার-দর্শিতা বিজয় পতাকায় জন্মভূমি শোভিত করুক, এই মহৎ

কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া মৃত্যুকে ভয় করিও না, সমরের সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও পরাক্রমের সহিত সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, পর-লোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।” বীর-জায়ার এই তেজস্বী বাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ “হর হর” ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল, তেজস্বিনী দুর্গাবতী এই উৎসাহান্বিত সৈন্যদলের পরিচালন-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করিতে যাইতে লাগিলেন।

দুর্গাবতী যখন অষ্ট সহস্র অশ্ব, সার্দ্ধেক সহস্র হস্তী ও সৈন্যদল সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার তদানীন্তন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে যবনসৈন্য সন্ত্রস্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে বাধা দিতে লাগিল! দুর্গাবতী প্রবল পরাক্রমের সহিত দুইবার আসফ খাঁর সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন, দুইবারই তাঁহার জয়লাভ হইল। যবনসৈন্য রাণীর সেনাগণের অমিত বিক্রমে ক্ষণকাল মধ্যেই বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া পড়িল, তাহাদের ছয়শত অশ্বারোহীর দেহরত্ন সমরাঙ্গণে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শেষে শত্রুগণ রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন-পর হইল। দুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। পরিশেষে সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইল দেখিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এই বিশ্রাম-সুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা-

অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠিল! গড়মণ্ডল-বাসী সৈন্যগণ সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য লালায়িত হওয়াতে দুর্গাবতী অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সেই রাত্রিতেই মুসলমান সেনানিবাস আক্রমণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; তাঁহার এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে আসফ খাঁর সৈন্যগণ নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীর্য্যবতী বীর-জায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না, সৈন্যগণের সকলেই ঈদৃশ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদর্শন করিল, এবং সকলেই তাঁহাকে বিনয় সহকারে নিশীথে যবনসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে গড়মণ্ডলের সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে তিনি অতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান ও সৈন্যদল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন প্রভাত না হইতে হইতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। গড়মণ্ডলবাসী সৈনিকগণ শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিল। আসফ খাঁ সেই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গাবতীর সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল, দুর্গাবতী এই আকস্মিক আক্রমণেও কিছুমাত্র ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট আশ্রয় পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান

হইলেন। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে সে স্থানে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী সুপ্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই প্রশস্ত সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া কুমার বীরবল্লভ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের এই লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে যবন সৈন্য স্তম্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্য যবনের আক্রমণে বীরবল্লভ আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্যুত পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রমে রণ-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় দুর্গাবতীর অধিকাংশ সৈন্য বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল, চারিদিকে যবনসৈন্য উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইতে ছিল, দুর্গাবতী কেবল তিন শত মাত্র পদাতি লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শত্রুনিক্ষিপ্ত একটী সুতীক্ষ্ণ শায়ক হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষুতে বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী এই বাণ বলপূর্ব্বক নেত্র হইতে নিঃসারিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া চক্ষুকোটরেই বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইহার পর আর একটী তীর প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পতিত হইল। দুর্গাবতী এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরাহত

হইয়া কাতর হইলেন, চারিদিক তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল, তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া অমিত বিক্রমে যবনসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় অনুসারে সমরক্ষেত্রে প্রাণপ্রিয় পুত্রসন্তানের শোচনীয় দশাও অকাতরভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায় সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু দুর্গাবতী ঈদৃশী অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় সমরভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না, ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া শত্রুর পদানত হইলেন না। বীরাঙ্গনা বীরধর্ম্ম রক্ষার্থ সমরক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে শোণিত ধারা অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, শারীরিক তেজঃ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি অম্লানবদনে ও ধীর ভাবে সমীপবর্ত্তী এক জন কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ করবাল গ্রহণ করিলেন, এবং অম্লানবদনে ও ধীরভাবে উহা স্বীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার লাবণ্যলীলাভূমি কমনীয় দেহ শবসমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ছয়জন সৈনিক পুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা এই অসমসাহসিকতার কার্য্য দর্শনে জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্রবেগে শত্রুদল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বহুসংখ্যক যবনসৈন্য মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, পর্য্যটকগণ অদ্যাপি পথ অতিবাহন সময়ে সেই স্থল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট। এই গিরিসঙ্কট একটী প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট হওয়াতে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য অবলোকন করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। যবন সেনাগণ গড়নগর বিলুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, কথিত আছে তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটী স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ কলস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সূতগণ দুর্গাবতীর অক্ষয় কীর্ত্তিকাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া সুমধুর বীণা সংযোগে নানা স্থানে গান করিয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড়রাজ্য এক্ষণে পূর্ব্ব গৌরব-ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন স্বাধীনতার সম্মান বর্ত্তমান রহিবে, যতদিন অতুলনীয় বীরত্ব অদীনপরাক্রম বীরেন্দ্রসমাজের এক মাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যতদিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই পবিত্র ও মধুর বাক্য স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত করিবে, এবং যতদিন আত্মাদর ও আত্মসম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া গগনস্পর্শী গিরিবরের ন্যায় সমুন্নত থাকিবে, ততদিন দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তি-কাহিনী স্বদেশ-হিতৈষী কবির রসময়ী কবিতায় এবং অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের সারল্যময়ী বর্ণনায়

বিঘোষিত হইবে, তত দিন দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ মেদিনী মণ্ডলে জাজ্বল্যমান রহিবে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না, এবং ভারতমহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা বিলুপ্ত হইবে না।

আকবর সাহ।

আক্‌বরের ন্যায় সুযোগ্য উদারমনা ও বিচক্ষণ সম্রাট কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার অপরিসীম সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা, তাঁহার প্রতাপ ও দেশ-বিজয়, বিজিত শত্রুর প্রতি তাঁহার দয়া ও উদার ব্যবহার, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি সমদর্শিতা এবং তাঁহার বিচক্ষণ ও সুশৃঙ্খল শাসন প্রণালী, তাঁহাকে দেবজন-বাঞ্ছিত পূজা ও সম্মান প্রদান করিয়াছে; এবং এই সকল অসাধারণ গুণেই তিনি আজিও হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুজাতি চিরদিন শক্তি ও মহত্ত্বের নিকট অবনত হয়, আক্‌বর সাহের দেবজনোচিত শক্তি ও মহত্ত্ব দর্শন করিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই অবৈধ ও অমানুষিক উপাধি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ফলতঃ আকবরের সদৃশ প্রকৃত মহাত্মা রাজা ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত পৃথিবীতেও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

আকবর সুদৃঢ় সুগঠিত ও অতিশয় গৌরকলেবর ছিলেন। তিনি যৌবনে সুরাপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন বটে, কিন্তু পরে বিলক্ষণ মিতাচারী হইয়া উঠেন। মৃগয়ায় তাঁহার অত্যন্ত

অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর শিকারে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদ ও বিভ্রাটের সম্ভাবনা, তাহাই অধিক ভাল বাসিতেন। অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর পর্য্যটনে মহা আমোদ অনুভব করিতেন; কখন কখন ইচ্ছা করিয়া পদব্রজেও এক এক দিনে পনর ষোল ক্রোশ পথ চলিতেন। অত্যল্পকাল নিদ্রাতেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত হইত। তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন, তথাপি যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। তিনি যে সকল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন তত্তাবৎই দিল্লীর পূর্ব্বাধিকার পুনরাহরণের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি অতিশয় নম্র, উদার, সদয় ও বদান্য ছিলেন। তিনি দর্শন ও পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক তর্কবিতর্কে একান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু স্বমতের বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি অণুমাত্রও বিরক্ত হইতেন না। বলে বা কৌশলে, প্রজাদিগের নিপীড়ন দ্বারা কোষ পরিপূরণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যুত তিনি মঙ্গলবর্দ্ধন দ্বারা প্রকৃতিবল্লভ হইবার জন্যই নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোনরূপ ইতর বিশেষ করিতেন না। গুণ থাকিলে উভয় সম্প্রদায়ীকেই অত্যুন্নত পদে স্থাপিত করিতেন। ফলতঃ হিন্দু মুসলমানদিগের পরস্পর প্রভেদ নিরাকরণ দ্বারা সমুদয় ভারতবর্ষীয়দিগকে একতাবদ্ধ করিয়া, সকলের আন্তরিক প্রণয় ও ভক্তিভাজন হইয়া রাজত্ব করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আদৌ আকবর মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, পরে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে মনুষ্যের প্রণীত

কোন প্রকার অর্চ্চনাপ্রণালী বা কর্ম্মকাণ্ড মান্য নহে; কারণ, কি প্রধান কি ক্ষুদ্র, মানব মাত্রেরই মতিভ্রম সম্ভব। তিনি বলিতেন "যুক্তিই আমাদের প্রকৃত উপদেশক, তদ্দারা পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও পরমদয়ালুত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। জঘন্য রিপুবর্গের দমন ও মনুষ্যের হিতকার্য্যসাধন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানেই নর পারলৌকিক সুখলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন।" আহার বিষয়ে আকবরের কোন প্রকার দ্রব্যের নিষেধ ছিল না। তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। তিনি মুসলমান-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অযৌক্তিক কর্ম্ম-কলাপের বিলোপ সাধনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পক্ষেও তিনি অনেক অযৌক্তিক পদ্ধতি রহিত করিবার প্রয়াস পান। তিনি অগ্নিপরীক্ষা, ধিধবাদিগের অমতে তাহাদিগকে স্বামীর চিতায় আরোপণ ও বাল্যবিবাহ নিষেধ করেন। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও অনুমতি দেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান রাজাদিগের সময়ে হিন্দুতীর্থযাত্রীদিগকে অনেক শুল্ক প্রদান করিতে হইত। আকবর তত্তাবৎ রহিত করেন। তাঁহার মতে যাঁহার যেরূপ চিত্ত, তিনি তদনুরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহার ব্যাঘাত চেষ্টা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। মুসলমান রাজ্যে মুসলমান প্রজা ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জিজিয়া নামে এক প্রকার শুল্ক প্রদান করিতে হইত। আকবর ভারতবর্ষে তাহা রহিত করেন।

ধর্ম্মবিষয়ে আকবরের প্রাগুক্তরূপ উদার মত দেখিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছিল।

অনেকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিত। উপাসনা বিষয়ে তাঁহার মতও এরূপ নির্ম্মল ও উন্নত ছিল যে, উহা সাধারণ জনের বুদ্ধিগম্য নহে। এপর্য্যন্ত কতিপয় প্রশস্তমনা পণ্ডিত ভিন্ন উহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; সুতরাং আক্‌বরের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই উহারও বিলোপ হয়।

আকবর হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একত্র করিয়া নিজ নিজ মতের পোষক তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতেন। সেই সকল বিষয়ে ফেজি ও আবুলফাজল নামে দুই সহোদর তাঁহার সহকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ফেজিই প্রথমে সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট অনুশীলন করেন এবং উহা হইতে বিবিধ কাব্য, দর্শন এবং বীজগণিত ও লীলাবতীরও অনুবাদ করিয়া উঠেন। আকবর গ্রীক্‌ভাষা হইতেও গ্রন্থ অনুবাদ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় যুবককে তদ্ভাষায় শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত একজন পর্টুগিজ পাদ্‌রিকে নিযুক্ত করেন। ফেজি স্বয়ং খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবাদে আদিষ্ট হন। ফেজির ভ্রাতা আবুলফাজল কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি আকবর-নামা অর্থাৎ আকবর চরিতের রচয়িতা। যাহা হউক, আবুলফাজল রাজনীতি ও সৈনিক কার্য্যেই অধিক বিখ্যাত হন। আকবর তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন।

আকবর স্বয়ং পরিচ্ছদ ও আভরণ বিষয়ে বিশেষ আড়ম্বর করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সভা অতীব সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। বিষুব সংক্রম ও সম্রাটের জন্ম-দিবসে মহোৎসব হইত। তখন সম্রাটের অধিবাস জন্য এক মহামূল্য উপকার্য্যা সন্নিবেশিত

হইত ; উপকার্য্যার সন্নিহিত বহু দূর ভূমি কাঞ্চন-কারু-ক্রিয়া-যুক্ত ক্ষৌমে মণ্ডিত হইয়া উঠিত। সম্রাট্ স্বর্ণময় তুলাধারে আসীন হইয়া ক্রমান্বয়ে সুবর্ণ রজত প্রভৃতি মহার্হ দ্রব্যে তুলিত হইতেন। পরে তৎসমুদায় দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হইত। সেই দুই উৎসব সময়ে সম্রাটের সদস্যেরাও অতিশয় আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদের উপরিস্থিত হীরকাদি বিবিধ মণির আভায় দিগ্বলয় সমুজ্জ্বল হইয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময় হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকেন, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদা-স্বরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলিজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদানদী পার হইলেন এবং খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল, হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলা-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদয় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল। কালক্রমে দেব-গড়ের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দৌলতাবাদ হইল।

মুসলমান আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু

সাম্রাজ্য বিপদ শূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদ স্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিলেন; সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং একটীর স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান রাজ্য হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজগণ একত্রিত হইয়া টেলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিল, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতা লুপ্ত হইল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশ-শাসনকার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। মহারাষ্ট্র দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বতদুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিত-যুদ্ধে অদ্বিতীয়, তাঁহারা নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য

করিতেন; এবং সময় সময় আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই; পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্ম বিরোধ দৃষ্ট হইত, এবং পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায় সর্ব্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীর যে রূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদ নগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভন্‌স্লে নামক দুইটী পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষিরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না; অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। ভন্‌স্লে বংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটী প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা এবং ভন্‌স্লে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাহজী, মাতার নাম জীজীবাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, জীজীর পিতা লক্ষজীযাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দু

রাজবংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একথা যথার্থ হইলে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রে পুনায় আসিয়া শাহজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই; কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানা রূপ মহরাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল। কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্ব কথা শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইল, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্ব্ব কালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; ধর্ম্ম বিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল।

এই রূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকাল মধ্যেই ধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমান বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, এবং যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায় এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েক দিন ক্রমাগত এই পর্ব্বতে ও উপত্যকার মধ্যে কাল যাপন করিতেন, কোন দুর্গ, কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটী দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধ বাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর যাহাতে সুচারুরূপে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাওলী জাতীয়দিগের কষ্ট সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, তাঁহার যৌবন

সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যশোজীকঙ্ক, তন্নজীমালশ্রী ও বাজীফাসল-কর নামক তিনজন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোন রূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে একটী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা সাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ ও জানিতেন না। তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা তাহা অনেক বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃ সদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্য দ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনিলেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন মনে করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্য-চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহ ভাবে বলিলেন

"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথের অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর" বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশ গুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, এবং কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্‌পটুতায় অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; তাহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনতায় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করিলেন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব

কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয় পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, এবং পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েক দিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, এবং সন্ধিস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

যদিও শিবজীর ক্ষমতা ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তা খাঁ দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন, এবং শিবজীকে এক বারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শায়েস্তা খাঁ সেই বৎসরেই পুনা, চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন, পর বৎসর শিবজীকে এক বারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্ত সিংহও এই বৎসরে বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তা খাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল, শায়েস্তা খাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, (অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন সেই গৃহেই) অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষ রূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয় নাই, দিল্লীর পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা কোন মতে সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

শিবজীর রণচাতুর্য্য।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকেও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই। দুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গতলে পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধারা সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কিন্তু বোধ করি যোদ্ধৃগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসংসাহসিক কার্য্যে একবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও

মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্ভিত হয়। অদ্য শায়েস্তা খাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসংসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একেবারে চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়াছিলেন, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন। এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও কখন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমুল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদ্‌কালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল,

বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত; ধীরে ধীরে বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ, বিদায় দিন্।" ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বর বলিলেন "তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে আমাদের কাহাকেও সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদ্‌কালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?" শিবজী উত্তর করিলেন "পেশওয়াজী, ক্ষমা করুন্, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, আপনারা থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।"

পেশওয়া বুঝিলেন, আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না! শিবজী পরে তন্নজী ও যশোজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাল্যসুহৃদ্! বিদায় দাও" দুই জনই খেদে নির্ব্বাক্! ক্ষণেক পর তন্নজী বলিলেন "প্রভো! কি অপরাধে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন?

কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিনীতীরে কে আপনার সহিত দিবাভাগে শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গ জয়ের পরামর্শ করিত? যশোজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন্ অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা করুন আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই; আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি; আপনার বাল্যসুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না!"

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল; মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশোজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! তোমা-দিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই; শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।" দুই জনে বিদ্যুৎ গতিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করি-লেন, তথায় বর্ষাকালের সায়ংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় রাশি রাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকিনী একটী ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন "মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।" জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলি-

লেন, "বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।" শিবজী সজলনয়নে উত্তর করিলেন, "মাতঃ আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?" "বৎস দীর্ঘজীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন্;" এই বলিয়া মাতা সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল। শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; উদ্বেগ-কম্পিতস্বরে বলিলেন "স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি; আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।" বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃভক্তির পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন। জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায় কালে বলিলেন "বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয় সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন।" শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। সমস্ত সেনা সজ্জিত, শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে

স্থানে সেনা সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বলিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্যসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী, তন্নজী ও যশোজী পঞ্চবিংশতি মাউলী সৈন্য লইয়া পুনার নিকটে যাইয়া একটী বাগানে লুক্কায়িত রহিলেন। আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক এক বার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, সময়ে সময়ে শৃগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

সহসা ঢং ঢং ঢং শব্দ হইয়া উঠিল; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না। ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন; বহু লোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে রাজ পথ দিয়া আসিতেছে; এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পথ লোকে সমাকীর্ণ এবং নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। শিবজী

নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তন্নজী ও যশোজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। 'হয় ত এই শেষ বিদায়' এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন। যাত্রীগণ শায়েস্তা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোক সমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন, খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল। শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়েস্তা খাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটী গবাক্ষ ছিল; তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না। এক খানি ইষ্টকের পর আর একখানি, তার পর আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা! পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার শব্দে যাইয়া শায়েস্তা খাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এই-রূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন,

শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন। পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল। তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল উঠিল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল এবং সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের ন্যায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্ ঝনা শব্দ, আক্রমণ কারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শাহস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। "সনাতন ধর্ম্মের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শায়েস্তা খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

শায়েস্তা খাঁ গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া পলায়ন

করিলের। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়া ছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা শায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলিতে লাগিয়া একটী অঙ্গুলী ছিন্ন হইল, কিন্তু শায়েস্তা খাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতে খাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারেন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে; তখনও মাউলীগণ মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, "আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু শায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।'

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়,

কিন্তু শায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন এবং যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। এবং নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

রাজা জয়সিংহ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আরংজীব নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায়, সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ এবং তাঁহার সহিত দিলাওয়ারখাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন।

শিবজী হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ

ছিলেন, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না। তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণীয়র লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়-সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন এবং বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জানিতেন, এ সমস্ত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিলেন না; অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, এবং রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। রাজা জয়সিংহ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্য বাক্য বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম; রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না!" রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী

আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।"

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবি রর বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন এবং রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন। শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।"

শিব। রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞা পালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়। হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এবিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভা ভঙ্গ হইল; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না;

তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন! জয়সিংহ দেখিলেম, তাঁহার চক্ষে জল! বলিলেন—"রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুন্ন হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, নিরাপদে প্রস্থান করুন্, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মৃত হইব না।"

রাজা জয়সিংহের এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দু-গৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহোদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জন্যও এখন খেদ করিতেছি না। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভাল বাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য ও ধর্ম্ম থাকে, তবে রাজপুত-শরীরে আছে। সেই রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?"

জয়। ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু

রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যত দিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন; বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনেও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।

শিব। আছি; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এত দিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্য?

জয়। যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখনই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি, তাহা করিব।

শিব। সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী তাহাদের সহিত কি সত্যসম্বন্ধ?

জয়। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, আপদে সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত! ক্ষত্রিয়রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে

উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্তবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও যাহা সত্য করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।

শিব। মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী; কিন্তু তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারীসেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ দিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হয় নাই; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি

সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।

শিব। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা, কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?

জয়। আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা?

শিব। তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

জয়। যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে প্রাণ দিতে ভয় পায়?

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন, "রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যুকে ভয় করে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দুগৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যে হিন্দু গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে,

দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে যাহার জন্য চিন্তা করিয়াছি; আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দু-স্বাধীনতার, সে হিন্দু-গৌরবের কি হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?"

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে বীরের চাতুরীতে হইবে?"

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেক ক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন "মহারাজ! আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন্। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্নের উদয় হইত। ভাবিতাম, যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে সমবেত করিলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দুনামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য,

হিন্দু-স্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্যবিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্ন মাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন্।

বহুদূরদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছু আমি জানি না। শিবজি! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিদিত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট তোমার প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি। রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজি! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারি দিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগল-রাজ্য আর থাকে না। যত্ন চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলি-সাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনতেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজি! তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী তোমাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই!"

উৎসাহে আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই

পতনোন্মুখ মোগলপ্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য ?

জয়। সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি, তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।

শিব। ভাল, আপনি সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন ; কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারাও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয় ?

জয়। ক্ষত্রিয়রাজ ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজি ! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা

দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে এই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখ রণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন; আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য জানিয়া আমি শত শত বার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকালব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে।

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, জয়সিংহ বলিতে লাগিলেন ;—

"শিবজি! এক্ষণে বিদায় দিন্; আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য কবিতেছি, যত দিন জীবিত থাকিবে, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহ্য কর, মোগল রাজ্য আর থাকে না, হিন্দুতেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, তোমার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।"

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়বর! আর এক দিন আপনার

সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর এক দিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।”

পৃথুরায়ের দুর্গ।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিতমনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই। এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক এক বার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছেন! রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ন্যায়শাস্ত্রিন্! আপনি কখন দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?”

রঘুনাথ। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিব। তবে সম্মুখে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে, বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য?

রঘুনাথ। মহারাজ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গপ্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হায়! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয় ছিলেন! হা! ন্যায়-শাস্ত্রিন্! সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, ঐ মরুভূমিস্থলে প্রশস্ত নগর বিজয়বাদ্যে শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে দিন হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুবীরগণ সবলহস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত, হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সে দিন গত হইয়াছে! ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্যস্থান ভারতভূমি অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্রকুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়; ভারতের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না? এক দিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস

ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! যে দিন যবন-গণ জয়লাভ করিল, সেদিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল? সংহারক! কেন ধর্ম্মবিনাশীদিগকে সংহার করিলে না?"

রঘুনাথ! কে বলিবে, কেন? যাহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিল তাহারা হিন্দুদেবমণ্ডলীরও অবমাননা করিতে ত্রুটী করে নাই; সেই ভীষণ পাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই। এই যে পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির দেখিতেছেন, উহার সুন্দর স্তম্ভসারের একটী স্তম্ভও ভগ্ন হয় নাই, তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্ত্তিগুলিও ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটী মূর্ত্তিরও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে না! কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধর্ম্মবিদ্বেষী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে; কিন্তু সহস্র দবমূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখ-মণ্ডলমাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে! বাসনা যে, দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবনগণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছে! যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভ-সার থাকিবে, ততদিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে!

শিবজীর স্বভাবতঃই হিন্দুধর্ম্মে অতি ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী আরও বলিতে লাগিলেন, "এদিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য দিকে যবনের গৌরব! এই যে সম্মুখে উন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া

উঠিয়াছে, এটী কুতবমিনার, কুতবউদ্দীনের বিজয়, হিন্দুদিগের পরাজয় জগন্মণ্ডলে ঘোষণা করিতেছে! এই দেখুন আণ্টমশ্ প্রভৃতি যবন রাজাদিগের গোরস্থানের উপর কিরূপ উন্নত সুন্দর প্রস্তরহর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; এই একটী মসজীদ্ প্রস্তুত হইতেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দুদেবালয় ভগ্ন হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজীদ্ উঠিতেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে। এই কুতবমিনারের উপর আরোহণ করুন্; মসজীদের পরে মসজীদ, গোরস্থানের পরে গোরস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী লক্ষিত হইবে, কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে, তাহার একটী স্তম্ভ বা একটী মন্দিরও নয়নগোচর হইবে না।"

নিঃশব্দে শিবজী, শম্ভুজী ও রঘুনাথপন্ত কুতবমিনারের উপর উঠিলেন। সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই! নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগদ্বিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এই স্থানে কি প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এই স্থানে কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যলোক রাজত্ব করিয়া সসাগরা ধরায় আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, ভারতের অতুল বীরবৃন্দ কি ইহারই নিকট আপন আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া

অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন? শিবজীর বাক্‌শক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল, গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি! আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরাবৃত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ! ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন্,—বল দান করুন্; যেন হিন্দুনাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।"

শম্ভুজীর হৃদয়ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজত্ব করিতেছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেই স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মসজীদ্, অসংখ্য মুসলমান সম্রাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতবমিনার হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া দেখা যাইতেছে। করাল কাল হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরের সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সে দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গপ্রাচীরের দিকে দেখিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "ন্যায়শাস্ত্রিন্! বাল্যকালে

পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম অদ্য যেন নয়নে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন, ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহু-জনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণশোভিত একটী বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়,—পথে ঘাটে বাটীতে, প্রাঙ্গণে, নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহু-বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে, উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদসম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডা-য়মান রহিয়াছে; অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতে-ছেন,—যেন এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরের দূত রাজ সভায় প্রবেশ করিল, অন্যান্য কথার পর দূত বলিল, 'মহা-রাজ! মহম্মদ-ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত?' মহানুভব চোহান্ উত্তর করিলেন—'যখন সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটী সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন।' রাজবাক্য শ্রবণে জয় জয় নাদে সেই প্রশস্ত প্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয় নাদে প্রশস্ত নগর ধ্বনিত হইল!

দূত পুনরায় বলিল, 'মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ-ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।

পৃথুরায় উত্তর করিলেন, ‘শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।’ অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল,—তিরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

ক্ষণেক পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ! সে দিন আমাদের গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় মনে নব নব আশার উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না; ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে। জগদিশ্বর রুগ্নকে আরোগ্যদান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন।”

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিঃশব্দে শিবিরাভিমুখে যাইলেন।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

(প্রাচীনকাল হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস নানাবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ; ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব

ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়ে অনেক বিচিত্র ঘটনা রাশীকৃত হইয়া আছে। হিন্দুগণ মধ্য আসিয়ার মালক্ষেত্র হইতে প্রথমে পঞ্জাবে আসিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে হিমালয় হইতে দক্ষিণাপথের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়, এবং বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়া উঠে। এই আদিম সভ্যতার সময়ে হিন্দুগণ মধুরস্বরে সামগান করিয়াছেন, উপনিষদের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের কবিত্বসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই শাস্ত্রজ্ঞান অন্যান্য দেশের উন্নতির মূল।

ইহার পর বৌদ্ধ অধিকার; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলে। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বীজ। হিংসা হিন্দুদিগের পুণ্যকর্ম্মের প্রধান সাধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র সোপান, মায়াময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তি অথবা স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথবা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের অধিকারকাল ব্যাপিয়া যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, শাক্যসিংহের প্রতিভা-

বলে সে শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে উন্নত হইয়া উঠে; বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে দলিত করিয়া সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে জাবা পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য প্রসারিত হয়।

কালের পরাক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার হিন্দুধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিল; ব্রাহ্মণগণ আবার শ্রমণগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন এবং বৌদ্ধ রাজগণের পরিবর্ত্তে আবার হিন্দু রাজগণের স্তুতিগীতিতে ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। কিছু কালের মধ্যেই মগধ সাম্রাজ্য এবং মগধ রাজগণের খ্যাতি ও প্রতাপ জলবিম্বের ন্যায় সময়ের অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া গেল এবং তাহার স্থানে উজ্জয়িনী রাজতার খরতর তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। এই তরঙ্গ কেবল নির্দ্দিষ্ট সীমাতেই আস্ফালন করিল না; ইহার আবেগ সঙ্কুচিত সীমাতেই সঙ্কুচিত রহিল না। ইহা সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া ক্রমে ভিন্ন দেশের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। সকলেই বৌদ্ধ রাজতার অত্যয়ে হিন্দুরাজতার এই অভ্যুত্থান বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হিন্দুগণ আপনাতে আপনি লুক্কায়িত না থাকিয়া চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রভুতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এরূপ পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতে ইহার স্রোত নিরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু দুই একটী তরঙ্গ ইতস্ততঃ তটাভিঘাত করিয়া বেড়াইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ বহু চেষ্টা করিয়াও এই তরঙ্গ নিবারণ করিতে পারেন নাই। পুরুষ-সিংহ বিক্রমাদিত্যের শাসনমহিমা

যখন আর্য্যাবর্ত্তকে উন্নত করে, শাস্ত্রদর্শী চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যখন হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন, তখন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শ্রমণগণও আপনাদের ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং হিন্দু নৃপতির ন্যায় বৌদ্ধ নৃপতিও কোন কোন স্থানে আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এইরূপে বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন নৃপতির শাসনে থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মধ্যকালে দক্ষিণাপথের এক জন নাম্বুরী জাতীয় ব্রাহ্মণ অদ্ভুত বিচারশক্তি, অদ্ভুত লিপি-কৌশল ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ভারতবর্ষ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করে এবং কেহ কেহ তাঁহার তেজোমহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোক গুরু মহাদেবের অবতার বলিয়া শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলে; এই ব্রাহ্মণের নাম শঙ্করাচার্য্য।

খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভ হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। ইহার পর একটী প্রবল পরাক্রান্ত বিধর্ম্মা জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত বিপ্লাবিত করে। বহু পূর্ব্বে পারসিকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই। বক্ত্রিয়ার গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষ দীর্ঘ কাল অস্থির থাকে নাই; আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত

হইয়া সিন্ধুক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সমের শোণিত মোক্ষণের পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত রহে নাই। খ্রীষ্টের এক সহস্র বৎসরের পরে যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার সার হীন হইয়া পড়ে। সুলতান মহম্মদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন সম্পত্তি এইরূপে দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থ বিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই; কিন্তু মহম্মদঘোরী মধ্যআসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহম্মদের অসম্পাদিত কার্য্য সম্পন্ন প্রায় করিয়া তুলিলেন। হিন্দুগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যথাশক্তি প্রায়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানদিগের অসীম চাতুরীর প্রভাবে তাহাদের পরাজয় হইল, দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য রবি ডুবিয়া গেল।

যে ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল, যে ইন্দ্রপ্রস্থ চৌহান রবি পৃথ্বীরাজের বিলাস ভবনে শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে মুসলমানের করায়ত্ত হইল। এইরূপে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল এবং এইরূপে এক বংশের পর আর এক বংশ দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল। এই নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। রাজ্যবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইল। দক্ষিণে রামানুজ, শক্তির

উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচার করিলেন, উত্তরে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত্নবান হইলেন, এবং মধ্যে কবীর, বেদ ও কোরাণ উভয়েরই অবমাননা করিয়া ঐশ্বরিক তত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছুকাল পরে নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক (চৈতন্য) পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেমপ্লাবনে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্মজগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন। ইঁহার নাম নানক। গুরু নানক কালান্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া এক ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং আপনার শিষ্যদিগকে উদার ও পবিত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম পদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী ধর্ম্মপরায়ণ বৃহৎ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে শিখ শব্দের উৎপত্তি হইল। এজন্য নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণ্যে শিখ নামে পরিচিত হইতে লাগিল।

আত্মশুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করা হয়। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা নহে। তবে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল

মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্য ও সদাচারে এই এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়।

মহামতি নানক যে সময় আপনার মত প্রচার করেন, যে সময় তাঁহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে আর একটী নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদের বিজয়পতাকা ধরাশায়ী হইলে যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংস্রবে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়! ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল, ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। ইহারা সাহস ও রণদক্ষতায় লোকের মনের উপর আধিপত্য প্রসারিত করিল, এবং সকলকে আপনাদের ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া উঠিল এবং হিন্দুদের পরিশুদ্ধ ভক্তি ও পবিত্র ঈশ্বর-প্রীতি সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া মহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাণের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন সংস্কার আসিয়া মুসলমান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। মহম্মদ ও তদীয় কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে অস্থির হইতে লাগিল।

সাম্প্রদায়িক মতের এইরূপ অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল এবং দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল! পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া নূতনের জন্য সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময় যিনি ধর্ম্মবিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানকের পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভৃতি কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থলবিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামানন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদের সংস্রবে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ে একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছিল, রামানন্দ এই একতা উদারতা ও নিষ্ঠা সঞ্জীবিত করিতে যত্নপর হইলেন। তিনি জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া সকলকেই সমভাবে আপনার সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রামানন্দের সমকালে গোরক্ষনাথ নামে আর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে যোগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন, এবং মহাদেবকে আরাধ্য দেবতা করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর কবীরের আবির্ভাব। কবীর ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধর্ম্মমতের আর এক গ্রাম উপরে আরোহণ করেন। রামানন্দ জাতিভেদ

উচ্ছেদ করিয়াও যে বাহ্য আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্নও রহিত করিলেন। তাঁহার মতে বাহ্য আড়ম্বর নিস্ফল, কেবল একমাত্র অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন। তিনি সমুদয় দেবদেবীর উপাসনা পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনায় সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহার পর চৈতন্যের অমৃতময় প্রেমের মোহিনী শক্তিতে ভারতবর্ষ বিমোহিত হয়। চৈতন্য জাতিভেদের উচ্ছেদ পূর্ব্বক পবিত্র ভক্তি ও পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নির্জ্জীব ভারতের হৃদয়ে জীবনীশক্তি অর্পণ করেন। এই সময়ে ত্রৈলঙ্গের বল্লভাচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণের উৎসাহে আবার একটী নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। বল্লভাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন নাই, এবং নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। তাঁহার মতে স্রক্‌চন্দনাদি সুখকর বিষয় উপভোগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য! বল্লভাচার্য্য এইরূপে ভোগ-বিলাসের অনুমোদন করিয়া শ্যামসুন্দর গোপালের উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

এইরূপে যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির দিকে উন্মুখ হয়। পীর ও মোল্লাদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ শান্তিলাভের আশায় নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কারের চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত-

বেগ সংযোজিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটী নূতন রেখা পাত করিয়া দেন। এইরূপ ঘর্ষণে প্রতি-ঘর্ষণে ভারতবর্ষ ক্রমেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গে দোলায়িত হইয়া পড়ে। উল্লিখিত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এক একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন! রামানন্দের রামসীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যের হরি, বল্লভাচার্য্যের গোপাল, ইহাঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত নানকের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাগুণে সুসংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন রাখিয়া যান, নানক তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুগোবিন্দ এই প্রশস্ত ভিত্তি-স্থাপিত প্রশস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম সকলকেই একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, এবং সকলের হৃদয়েই অচিন্তনীয় উৎসাহ-শক্তি দ্বিগুণিত করিয়া দেন।

গুরুগোবিন্দ মোগল সাম্রাজ্যের চরম সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল; ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল; এক্ষণে একতা ও স্বার্থ-ত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল, তিনি

সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে নূতন তেজ, নূতন সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত রাজত্বে বাস করিয়া সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া সেই ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতিও সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানবী ইচ্ছার একাগ্রতা ও মানবহৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনার্থ এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ এক নূতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিখদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই এক হাড় এক প্রাণ হইয়া একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহা হিন্দুদিগের ক্রিয়াপদ্ধতি, মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুশাসন সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখসমাজ সংগঠিত করিলেন, এইরূপে ধীরে ধীরে নব অভ্যুদিত শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত

করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারাই এক্ষণে এক প্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত হইল।

সম্পূর্ণ।